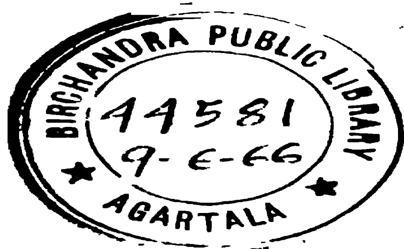
জীবনশিল্পী

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়



ডি. এম. লাইব্রেরী
কলিকাতা ৬

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৯৪৯
দাম পাঁচ সিকা

মুদ্রাকর—শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস,
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

জীবনশিল্পী

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্যান্য প্রবন্ধের বই

তারুণ্য

আমরা

ইশারা

বিনুর বই

জীয়নকাটি

দেশকালপাত্র

ছোটগল্পের বই

প্রকৃতির পরিহাস

মনপবন

কবিতার বই

নূতনা রাধা

কামনা পঞ্চবিংশতি

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

এমন অনেক শিল্পীর কথা আমরা জানি যাঁদের হাতের ছোঁয়া লেগে পাষাণ হয়েছে অহল্যার মতো শাপমুক্তা সুন্দরী, কিন্তু যাঁদের নিজেদের জীবনের বেলায় তাঁদের শিল্পীত্ব খাটেনি। সে-ক্ষেত্রে তাঁরা অবস্থার দাস এবং তাঁদের জীবনের আদর্শও দুর্ব্বল। অথচ শিল্পী নন্ এমন কোনো কোনো মানুষের জীবন এক-একখানি শিল্পসৃষ্টির মতো সযত্নরচিত, সুসঙ্গত, অবান্তরতাবিহীন।

রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁর অপরাপর কাব্যের মতো ক'রে তাঁর জীবনকালকেও ছন্দে মিলে উপমায় ব্যঞ্জনায় কল্পনার প্রসারে ও অনুভূতির গভীরতায় একখানি গীতিকাব্যের ঐক্য দিয়েছেন। সেটি বেশ একটি গোটা জিনিস হয়েছে, ভাঙা ভাঙা বা অসম্বদ্ধ হয়নি, অন্তর্বিরোধসম্পন্ন বা অসঙ্গতি-বহুল হয়নি। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তাঁর জীবন। তাঁর অন্যান্য কীর্ত্তি বিস্মৃত হ'য়ে যাবার পরও তাঁর এই কীর্ত্তিটি জীবিত মানুষের আন্তরিকতম যে-জিজ্ঞাসা—"কেমন ভাবে বাঁচব?"—সেই জিজ্ঞাসার একটি সত্য ও নিঃশব্দ উত্তর হ'য়ে চিরস্মরণীয় হবে।

দেশের অতি বড় দুর্গতির দিনে যখন পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শকে লোকে যুগপৎ উপহাস ভয় ও সন্দেহ কর্‌ছে তখন রামমোহন রায়ের জন্ম। এই মহাপুরুষ শাশ্বত ভারতবর্ষকে আবিষ্কার ক'রে তাকে একটি বৃহত্তর পরিধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন দেশকালের অতীত হ'য়ে বাঁচ্‌বার দৃষ্টান্ত। আধুনিক ভারতবর্ষের জনক ঋষি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের জনক। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন ঋষি-দৃষ্টি ও মহত্ত্বের প্রতি নিয়ত আকাঙ্ক্ষা। ঠাকুর পরিবারে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আধুনিক পৃথিবীর সমন্বয় ঘটেছিল। যৌবনারম্ভে মহর্ষি উপনিষদের পৃষ্ঠা কুড়িয়ে পান্‌ ও মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁকে Geologyর গ্রন্থ পড়্‌তে দেখা গেছ্‌ল। এই দুটি ঘটনা থেকে ঠাকুর পরিবারের আবহাওয়া অনুমান করা যায়। ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, ত্যাগে ও ভোগে, কলায় ও বিদ্যায়, স্বাজাত্যে ও বিশ্বমানসিকতায় ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল। স্কুল-কলেজের অপেক্ষা রাখেনি। এই পরিবারের কাছে ও মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পেলেন তাঁর বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা।

স্কুল-যন্ত্রের কবল থেকে অক্ষত দেহ মন নিয়ে বেরোতে পারা রবীন্দ্রনাথের মতো শক্তিধর ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব হ'ত। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন, রুটিন ও এগ্‌জামিনের যুগল হস্তের ঘন ঘন চপেটাঘাতে কল্পনাবৃত্তি অসাড় হ'য়ে যায় ও পাঠ্যপুস্তকে নিবদ্ধ হ'য়ে পর্য্যবেক্ষণ শক্তি হয় আড়ষ্ট। পাছে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে ও তার ফলে বিক্ষেপ জাত হয় তার দরুণ স্কুল-ঘরের

চারদিকে চার দেয়াল প্রহরীর মতো খাড়া। যঃ পলায়তি স জীবতি। রবীন্দ্রনাথ স্কুল পালিয়ে নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন। আজও সে-দায়িত্বে ঢিলে দেননি। তাঁর মতো বহুবিদ্য ব্যক্তি যে-কোনো দেশে বিরল। কিন্তু অধীত বিদ্যা প্রচার করার চেয়ে বিদ্যার সৌরভ বিকীরণ করাই যথার্থ পাণ্ডিত্য। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাকে রসায়িত ক'রে কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন, তা নিয়ে থীসিস লেখেননি। তাঁর লঘুতম রচনাতেও মার্জ্জিত বুদ্ধির যে-দীপ্তি দেখ্‌তে পাই সে-দীপ্তি অশিক্ষিত পটুত্বের নিদর্শন নয়। প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমাদের একটা ভ্রান্তি আছে—তাঁরা বিনা সাধনায় সাফল্য লাভ করেন, যেহেতু তাঁরা দৈবশক্তিসম্পন্ন। রবীন্দ্রনাথ ডায়েরী রাখেননি, কিন্তু তাঁর "ছিন্ন পত্র" থেকে জানি তিনি যেমন সব্যসাচী লেখক তেমনি সর্ব্বভুক্ পাঠক এবং তাঁর পর্য্যবেক্ষণশীলতা ও কল্পনাকুশলতা কি প্রকৃতির সংসার, কি মানবের সংসার, উভয়ের অন্তরবাহির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করেছে।

স্কুল-কলেজে না গেলে ভদ্র সমাজে এক-ঘরে হ'তে হয় এবং জীবিকা সম্বন্ধেও অতি বড় ধনী সন্তানের ভয় থাকে। রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে স্কুল ত্যাগ ক'রে তাঁর নিজের দিক থেকে ঠিক ক'রলেও অন্য সকলে নিশ্চয়ই তাঁকে নিরস্ত কর্‌বার চেষ্টা করেছিলেন ও তিনি ভুল কর্‌লেন ব'লে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। জীবনশিল্পী এম্‌নি ক'রেই নিজের পরিচয় দেন। পশু-পক্ষীর ইনস্টিংক্টের মতো শিল্পীপ্রকৃতি মানুষের মধ্যেও ইনটুইশনের ক্রিয়া আমোঘ।

কোন্ পথে মহতী বিনষ্টি তা ওঁরা লাভ-লোকসান তৌল না ক'রে যুক্তিতর্কের মধ্যে না নেমে আপনার অপ্রবৃত্তি থেকেই উপলব্ধি করেন এবং আত্মহত্যার পথকে সমগ্র শক্তির সহিত পরিহার করেন।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনোদ্‌গমে বিলাত-যাত্রা তাঁর স্কুল-পরিত্যাগেরই মতো একটি অর্থপূর্ণ ব্যাপার। তখনো আমাদের সমাজে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ও অপ্রচলিত ছিল। অথচ বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় কেবলমাত্র বিদেশী গ্রন্থপাঠের দ্বারা হ'বার নয়। পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'ল না, এর মতো দুঃখের কথা অল্পই আছে। বিশেষত যে-মানুষকে একদিন মানব মাত্রের বন্ধু হ'তে হবে, প্রতিভূ হ'তে হবে, মানব সম্বন্ধে তুলনা-মূলক জ্ঞান তার সাধনার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ কর্‌বার পূর্ব্বে স্বদেশের সঙ্গে বিদেশকে ও নিকটের সঙ্গে দূরকে মিলিয়ে দেখা, পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় মহাদেশের বহুকালীন আদর্শ। তার ফলে মাত্রাজ্ঞান জন্মায়, অহঙ্কার ও মোহ কিছু কমে এবং নিজের ও পরের মাঝখানকার সত্যকার সীমারেখাটি আবিষ্কৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শোনা গেছে যে, তিনি জমিদার হিসাবেও বিচক্ষণ ছিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ জমিদার হ'বার দরুণ তাঁর বাণী তিক্ত, উদ্ধত বা বিষয়ীসুলভ হয়নি। পরন্তু বিচক্ষণ জমিদার হ'বার দরুণ তাঁর রচনা রুগ্ন আদর্শবাদ ও গলদশ্রু ভাবালুতা থেকে মুক্ত। পরোপকার কর্‌তে চাইলেও করা উচিত নয়, যদি তার

ফলে পরের আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা হয় বিড়ম্বিত। আমাদের দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, কাঙালীভোজন ইত্যাদি আদর্শ এমন অস্বাস্থ্যকর যে, যথার্থ করুণা ও লোকপ্রীতির পৌরুষ তাতে নেই।

প্রাচীন ভারতবর্ষের গার্হস্থ্যের আদর্শই হচ্ছে সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব কালের পূর্ণবয়স্ক মানুষের আদর্শ। তার মধ্যে ভোগ ও ত্যাগ, আনন্দ ও সংযম পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। কেবল বিপন্নকে অভয়দান ও আতুরের সেবা নয়, অন্যায়কারীকে আঘাত ও অশিষ্টকে শাসনও তার অন্তর্গত। বিষয়সম্পত্তিকে উক্ত আদর্শ বিষের মতো পরিহার করতে বলেনি, বৃদ্ধি করতে রক্ষা করতে ও বিত্তের মতো ব্যবহার করতে বলেছে। এই সম্পূর্ণতার আদর্শ সেকালে কিম্বা একালে বহু মানুষকে নেশা পাওয়াতে পারেনি। তাই সেকালে লোকে সন্ন্যাসী হ'য়ে যেত, একালে সোশ্যাল সার্ভিস নিয়ে মাতে। বিচিত্র সংসারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কর্ত্তব্যগুলোর প্রত্যেকটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাতে চরিত্রের প্রতি অঙ্গের চালনা হয়। এই চালনাই স্বাস্থ্যকর। দুনিয়ার দুঃখদৈন্য দূর হ'ল কি-না সেটা ভাবতে যাওয়া অস্বাস্থ্যকর।

রবীন্দ্রনাথের গৃহস্থাশ্রমের দৃশ্য আমরা তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পত্র-বিনিময়ের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাই। ক্রমে ক্রমে যখন অন্যান্য চিঠিপত্রের বাতায়ন-দ্বার মুক্ত হবে তখন পূর্ণ দৃশ্যটি উদ্‌ঘাটিত হবে। সেটির এটা-ওটা ক'রে অনেক রেখা ও রঙ আমাদের অপছন্দ হ'লেও আমাদের কাছে সমগ্র চিত্রখানির মূল্য কমবে না। রবীন্দ্রনাথ কাঁচা বা পাকা যা-কিছু লিখেছেন,

হাতের লেখার দিক থেকে প্রত্যেকটি সুন্দর এবং সাহিত্যের দিক থেকে প্রত্যেকটি স্বকীয়। এর থেকে অনুমান হয় যে, তুচ্ছ বা মহৎ কোনো কাজই তাঁর পক্ষে হেলাফেলার যোগ্য নয় এবং তাঁর অন্তঃপ্রকৃতি সর্ব্বমুহূর্ত্তে সতর্ক থাকে পাছে তাঁর বহিঃপ্রকৃতিতে কিছুমাত্র কুশ্রীলতা বা মামুলিয়ানা প্রকটিত হ'য়ে পড়ে।

একালের মনুষ দিন দিন পল্লীকে ছেড়ে নগরে জুট্‌ছে। নগরের প্রধান আকর্ষণ তার নিত্য নূতন চমক, নিত্য নূতন খবর, নিত্য নূতন শিক্ষা, নিত্য নূতন সঙ্গ। এ আকর্ষণকে উপেক্ষা করা যায় না। কত অঞ্চলের কত দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা হয়; তাদের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের অভ্যস্ত আচার ও মনগড়া বিচারকে আমরা আর-একটু উদার করি। কিন্তু হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র চরিতার্থতার জন্যে পল্লীই ছিল ভালো এবং পল্লীতে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে পশুপক্ষী-বৃক্ষলতা-নদী-পর্ব্বতের বৃহত্তর সমাজে ছিলুম। নগর যেমন নিত্য নূতন, পল্লী তেমনি চিরন্তন। দুটোই সত্য এবং দুটোকে জড়িয়েই সত্য। রবীন্দ্রনাথ পল্লীর প্রতি পক্ষপাত কর্‌লেও নগরকে বর্জ্জন কর্‌লেন না। প্রকৃতির সুধা ও জনসংঘাত-মদিরা পান ক'রে তিনি উভয় সত্যের স্বাদ গ্রহণ কর্‌লেন। পদ্মাবক্ষে নৌকা-বাসের দিনগুলি আধুনিক যুগের নাগরিক মানুষের কাছে কেমন রোমান্সের মতো লাগে। অতটা নির্জ্জনতা আমাদের সয় না। তাতে আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্নিমান্দ্যের সূচনা কর্‌ছে। পল্লী ও নগর উভয়কে উপভোগ কর্‌তে পারা চাই। শুধু একবার চোখ বুলিয়ে গিয়ে উচ্ছ্বসিত

হওয়া উপভোগ করা নয়। একান্তভাবে সভ্য ও আধুনিক হ'তে গিয়ে যা সৃষ্টি কর্‌ব তা আধুনিকতার মতো অচিরস্থায়ী ও সভ্যতার মতো অগভীর হবে। অবিমিশ্র নাগরিক অভিজ্ঞতার উপদ্রব আমরা সাহিত্যে পোহাচ্ছি। চিড়িয়াখানায় গিয়ে জীব-চরিত্র অধ্যয়ন করার মতো নগর থেকে কি মানব-চরিত্র, কি বিশ্বব্যাপার, কোনোটার ঠিক মতো নিরিখ হয় না। বাস্তব ব'লে যাকে চালাই সেটা একটা বিশেষ অবস্থায় বাস্তব। বন্ধ ঘরে প্রতিধ্বনির মতো জীবনের হাহাকারকে নগর অতিরঞ্জিত করে। জীবনের দুঃখ-দৈন্যগুলোকে অপরিমিত কালের পট-ভূমিকায় প্রসারিত কর্‌লে তাদের সত্যিকারের পরিমাণ উপলব্ধি করি এবং মানুষের সংসারকে অপরিমিত প্রাণলোকের অধিকারভুক্ত ব'লে জান্‌লে যা নিয়ে উত্তেজিত পীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত বোধ কর্‌ছি তার দিকে সুদূরের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আনন্দ পাই।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনের দিনগুলি অল্প পরিসরের মধ্যে সত্য ছিল, সম্পূর্ণ ছিল। সাংসারিক উচ্চাভিলাষ তাঁর ছিল না এবং সাহিত্য তাঁকে দেশের সর্ব্বত্র পরিচিত কর্‌লেও দেশের কর্ম্মপ্রবাহ থেকে তিনি দূরেই ছিলেন। হঠাৎ একদিন দেশে নব-যুগের প্রাণ-স্পন্দন এল, সে যে কী অপূর্ব্ব জন্মলক্ষণ "ঘরে-বাইরে"তে তার বর্ণনা আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিভৃত সাধনা ছেড়ে সকলের সঙ্গে যোগ দিলেন। বৃহৎ সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য একদিন না একদিন কর্‌তেই হবে—দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি। কিন্তু সেই কর্ত্তব্য যার প্রতি, সে যে পরিমাণে

বৃহৎ, কর্ত্তব্যের পূর্ব্বাহ্নের সাধনাও যেন সেই পরিমাণে বিপুল হয়। দেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা কেবলমাত্র পণ্যনিবদ্ধ ছিল না, দেশের ধর্ম্ম, সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যদের মতো তাঁরও অনুরাগের সামগ্রী ছিল। দেশের শিল্পদ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা এঁরা স্বদেশী আন্দোলনের চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই ক'রে আস্‌ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতি জনকয়েক মিলে একটি স্বদেশী বস্ত্রের দোকানও খুলেছিলেন। দেশে জন্মেছি ব'লে দেশ আমার নয়, দেশকে নিজের তনু-মন দিয়ে সৃষ্টি করেছি ব'লে দেশ আমার, পেট্রিয়টিজ্‌মের এই সূত্রটি দেশকে রবীন্দ্রনাথ ধরিয়ে দিলেন। দেশ এর মর্য্যাদা তখন বুঝ্‌ল না, এতদিন পরে আজ বুঝ্‌ছে।

দেশের প্রাচীন শিক্ষাকে আধুনিক কালের উপযুক্ত ক'রে দেশকে একদিক থেকে সৃষ্টি করার ব্রত নিলেন তিনি নিজে। এই উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা। আধুনিক কালে 'আশ্রম' কথাটির অর্থ বদ্‌লে গেছে। এখন আমরা 'আশ্রম' বল্‌তে সাধনাপীঠ বুঝে থাকি। যথা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম প্রাচীন অর্থের আশ্রম অর্থাৎ অবস্থা। রবীন্দ্রনাথের গার্হস্থ্যাশ্রম ও তাঁর শিষ্যগণের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পরস্পরের পরিপূরকতা করল। এর আরম্ভ অতি সামান্য আকারে। এর দ্বারা রাতারাতি দেশের দুঃখমোচনের আশা ছিল না। নিরক্ষরতা দলন নয়, অর্থকরী বিদ্যাবিস্তার নয়, জনসেবা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। জীবনের সর্ব্বাঙ্গীনতার প্রতি দৃষ্টি

রেখে জীবনের প্রথম অঙ্গের অনুশীলন, পরিপূর্ণরূপে বালক হওয়া। আজ যারা পরিপূর্ণরূপে ফুল হ'তে পেরেছে, তারাই কাল পরিপূর্ণরূপে ফল হ'তে পারে, অপরে নয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী বালকের দেহ-মনকে নানাদিকে স্ফূর্ত্তি দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ খেলা, অভিনয়, গান ও উপাসনা এগুলিকে বিদ্যাশিক্ষার মতোই প্রয়োজনীয় ব'লে গোড়া থেকেই জেনেছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা বা নীতিশিক্ষাকে স্ফীত হ'তে দেননি এবং অপরগুলিকে ওর কোনোটার বাহন করেননি। বিদ্যার্জ্জনই বালকের একমাত্র বা প্রধান করণীয়, সভ্য-সমাজ থেকে এই বদ্ধমূল কুসংস্কার যদি কোনো দিন ঘোচে তবে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশ ও জগৎ আরেকটু ভালো ক'রে বুঝবে।

অল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিক প্রিয়জনের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের দারুণ দুর্ভাগ্য। কিন্তু এই করুণ অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথ অপচিত হ'তে দেননি। তাঁর "খেয়া" ও "গীতাঞ্জলি" এই বেদনার রূপান্তর। তাঁর জীবন ও তাঁর কাব্য যেন এমন একটা পরিণতির প্রতীক্ষা করছিল। ফলে পক্বতার পক্ষে প্রখর রৌদ্রের প্রয়োজন ছিল। তাঁর মধ্যে কারুণ্যের সঞ্চার না হ'লে তিনি সকলের সবকালের কবি ও প্রতিভূ হ'তে পারতেন না। প্রিয়-বিয়োগের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়ত্বকে একান্ত mystic-ভাবাপন্ন করলে। তিনি ভগবানের মধ্যে হারানো প্রিয়দের সঙ্গ পেলেন, তাই ভগবান হ'লেন তাঁর প্রিয়তম। যিনি এতদিন পিতা ছিলেন, তিনি হলেন সখা ও প্রেমিক। "গীতিমাল্য" ও "গীতালি" রচিত হ'ল।

অকস্মাৎ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী-ব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হন্। ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ নেই। রোগশয্যাবিনোদনের জন্যে কয়েকটি বাংলা রচনার ইংরেজী তর্জ্জমা করেছিলেন, সেগুলি কী মনে ক'রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইরিশ কবি ইয়েট্সকে পড়তে দেন। একদা যেমন দুর্ঘটনার ভিড় জমেছিল একদিন তেমনি যশ, অর্থ ও সম্মান বন্যার মতো দিক্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত ক'রে এল। দুঃখের সময় যিনি অভিভূত হননি সুখের দিনেও তিনি অভিভূত হ'লেন না। বঙ্গের কবি বিশ্বের অর্ঘ সহজভাবে নিলেন। ছিন্ন ভিন্ন পরাধীন দীন দরিদ্র দেশের মানুষ সাধনা করেছিলেন দিগ্বিজয়ীর মতো, আরম্ভ করেছিলেন রাজকীয় ধরণে। হাতে রেখে দান করেননি, হাতে-হাতে ফল চাননি। যাঁর অধিক মূলধনের কারবার, তাঁর বিরাট ক্ষতি, বিরাট লাভ, তাঁর লাভের জন্যে ত্বরা নেই। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ও ব্যাপক যোগাযোগ, মানুষের গভীরতম চরিত্রে আস্থা, ভগবানের কল্যাণবিধানে সংশয়হীন বিশ্বাস, সৌন্দর্য্যের রসায়নে ব্যবহারিক জীবনকেও রসায়িত করা—এতগুলো বড় বড় জিনিস কি ছোট একটি দেশে আবদ্ধ থাকতে পার্‌ত? দু'দিন আগে না হ'লে দু'দিন পরে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়্‌ত। তারপর রবীন্দ্রনাথ চিরদিন up-to-date; বিশ্ব-সাহিত্য তাঁর ভালো ক'রে জানা, বিশ্বের আধুনিকতম ভাবনাগুলো তাঁরও ভাবনা। বাংলা দেশের পদ্মা নদীতে নৌকা-বাস কর্‌বার সময় তিনি বিশ্বের কেন্দ্রস্থলেই বাস করেছেন।

বিশ্ববিখ্যাত হ'বার পর থেকে তাঁর দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেল।

বৃহত্তর মানব-সংসারের ব্যাপারে তাঁর ডাক পড়্‌ল। গত মহাযুদ্ধের বিনষ্টির ক্ষণে Nationalism সম্বন্ধে তাঁর নির্ভীক উক্তি তাঁকে তখনকার মতো অপ্রিয় কর্‌লেও আজ সভ্যজগতের বহু মনীষী ব্যক্তি তাঁরই মতে মত মিলিয়েছেন। মানুষের নতুন ভবিষ্যতের তিনি অন্যতম স্রষ্টা, সেই ভবিষ্যতের প্রতি বাৎসল্য তাঁর স্বদেশ-বাৎসল্যকেও ছাড়িয়ে যায়, তাই তাঁকে আমরা ভারতবর্ষের নেশন্ হওয়ার দিনে পাচ্ছিনে। কিন্তু যখনি ধর্ম্ম আমাদের পক্ষে, তখনি তিনি আমাদের পক্ষে। জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের প্রতিবাদ কর্‌তে তিনি মুহূর্ত্ত মাত্র দ্বিধা বোধ করেননি।

মহাযুদ্ধের পর ইউরোপখণ্ডে লীগ্ অফ্ নেশন্-এর প্রতিষ্ঠায় Nationalism-এর জড় মর্‌ল না। যা যেমন ছিল তা প্রায় তেম্‌নি থাক্‌ল। মানুষের চরিত্রে যা শ্রেষ্ঠ, তা নিয়ে নেশনও নয়, লীগ্ অফ্ নেশন্‌স্‌ও নয়। স্বার্থের উর্দ্ধে না উঠতে পার্‌লে মিলন সত্যকার হ'তে পারে না। হাট-বাজারকে আমরা মিলনস্থলী বলিনে। মানুষ যেখানে জ্ঞান-বিনিময়, প্রীতি-বিনিময় করে, সেইখানে তার মিলন-তীর্থ। রবীন্দ্রনাথ একপ্রকার বে-সরকারী লীগ স্থাপন করলেন, অফ্ নেশন্‌স্ নয়—অফ্ কাল্‌চারস্। তাঁর বিশ্বভারতী বিশ্বের সকলের ভারতী। মহাযুদ্ধের মহাপ্রলয়ের পর এই একটি সৃষ্টির মতো সৃষ্টি! আজ যথেষ্ট মর্য্যাদা পাচ্ছে না এ। বটবৃক্ষের বীজের মতো এর আকার ক্ষুদ্র, আয়োজন অল্প। কিন্তু বিপুল সম্ভাবনা যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের থাকে তবে

এরই আছে। আমাদের গৌরব এই যে, "এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে" এমন একটি পুণ্য তীর্থের প্রতিষ্ঠা হ'ল।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হ'য়ে, শতায়ু হ'য়ে, তাঁর জীবন-শতদলের অপরাপর দলগুলি উন্মোচন করতে থাকুন। সেই তো তাঁর মুক্তি। একটি মুক্ত পুরুষের দৃষ্টান্ত লক্ষ মুক্ত পুরুষের আবাহন করে। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা; রবীন্দ্রনাথের উত্তর পুরুষরা এই ব'লে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ রইবেন যে, মানুষকে মানুষের যা চরম উত্তরাধিকার তাই তিনি দিয়ে গেলেন। সেটি হচ্ছে, "কী ভাবে বাঁচ্‌ব" এই জিজ্ঞাসার নিঃশব্দ উত্তর।

"ফাউস্ট"

ব্যক্তির জীবনে দেখি এক বয়সের একটি আইডিয়া দিন দিন পরিণত হতে হতে পরবর্ত্তী বয়সে যেই সম্পূর্ণ হয় অমনি সমাপ্ত হয়। তখন আর মনের ভিতর তার খোঁজ পাওয়া যায় না, তার আশ্রয়স্থল তখন স্মৃতি।

জাতির জীবনেও সেইরূপ। তবে জাতির জীবন হচ্ছে বড় স্কেলের ব্যাপার। যেমন তার আকার তেমনি তার আয়ু। তার সামান্য দুই দশ শতাব্দীর ইতিহাসে কত ঘটনা, কত অঘটন, কত রাজ্য ভাঙাগড়া, কত পতন অভ্যুদয়। এত কিছুর মধ্যেও এক একটি আইডিয়া জাতির মানসে স্পষ্টতা লাভ কর্‌ছে। পরিশেষে একটি অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে, একটি আন্দোলনে বা বিপ্লবে, একখানি কাব্যে বা কীর্ত্তিতে তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে।

ইউরোপের মধ্যযুগে এমনি একটি আইডিয়া ছিল সয়তানের সঙ্গে চুক্তি। সয়তানকে লোকে ঘৃণা কর্‌ত, গাল পাড়্‌ত, ভয় কর্‌ত অথচ সয়তানের আকর্ষণও তলে তলে অনুভব কর্‌ত। ফাউস্ট নামে সত্যিকার এক পণ্ডিত নাকি সয়তানের কাছে পরকাল বিক্রয় করে ইহকালে সয়তানের শক্তি কিনেছিল। অত বড় যাদুকর নাকি আর ছিল না। মুখে ফাউস্টের মুণ্ডপাত কর্‌লেও মনে তার সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল সকলের। তার বিষয়ে রচিত হয়েছিল অনেক গ্রন্থ, চলিত হয়েছিল অনেক কাহিনী,

অভিনীত হয়েছিল অনেক পালা। সেগুলিতে তার শোচনীয় পরিণাম—তার অপমৃত্যু ও সয়তানের অধিকারে তার আত্মার দুর্গতি—আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছিল বটে, কিন্তু যাবজ্জীবন লোকটা যে সুখের জীবন, সখের জীবন, যখন-যা খুশির জীবন কাটিয়ে গেল তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছিল সাড়ম্বরে।

ফাউস্ট হতভাগাটা যে অমন একটা চুক্তি করে নিতান্তই ঠকে গেল মধ্যযুগের শেষভাগের মানুষ অন্তরে তা স্বীকার কর্‌তে পার্‌ছিল না। পরকালের ভয় যতই কমে আস্‌ছিল ইহকালের সম্ভাবনা ততই বৃহৎ মনে হচ্ছিল। বিজ্ঞান এল, প্রকৃতির বস্ত্রহরণ হতে থাক্‌ল, সয়তানী যন্ত্রপাতির সাহায্যে এঞ্জিনিয়ার একে একে বহু অসাধ্যসাধন করল। তখন যাদুকর ফাউস্টের উপর শ্রদ্ধা জাত হল। সয়তানের খুর, লাঙ্গুল ও শিং খসে গেল। সয়তান বলা হল বিশ্বসংসারের অন্তর্নিহিত সেই পরশ্রীকাতরতাকে যা অহরহ ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়ায়, সাজানো বাগান শুকিয়ে দেয়, যজ্ঞ পণ্ড করে, ভালোকে দিয়ে ভালোর সর্ব্বনাশ ঘটায়। এমন যে সয়তান সে মানব-সংসারে ভদ্রবেশী।

কালক্রমে ফাউস্ট ও সয়তান উভয়ের বিবর্ত্তন হয়েছিল জনগণের কল্পনায়। Goethe যখন উভয়ের চুক্তির আইডিয়াটিকে পূর্ণতা দিয়ে চুকিয়ে দেবার সঙ্কল্প কর্‌লেন ততদিনে ফাউস্টের পরিণাম-সম্বন্ধে লোকের রুচি বদ্‌লেছে। লেসিং বললেন, ফাউস্টের তো স্বর্গে যাবার কথা। মৃত্যুর পরে তার আত্মা সয়তানের খপপরে পড়বে এ যে অসহ্য।

অথচ যে মানুষ সাক্ষাৎ সয়তানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে মর্ত্ত্যকেই পরম বলে গণ্য কর্‌ল, স্বর্গের চিন্তা মনে আন্‌ল না, তাকে স্বর্গে নিয়ে গেলে পাপ পুণ্যের পরিণাম ভেদ থাকে না। আর সয়তানকেও তার শিকার থেকে বঞ্চিত কর্‌লে অন্যায় হয়। Goethe এই সমস্ত কারণে চুক্তির মধ্যে একটি ফ্যাকড়া রাখ্‌লেন। ফাউস্ট বলল সয়তানকে, "তুমি আমাকে যা দেখাবে যা দেবে যেখানে নিয়ে যে অবস্থায় রাখ্‌বে তাতে যদি আমার বিন্দুমাত্র সন্তোষ হয়, তাতে যদি আমি আসক্ত হই তবেই আমার আত্মা তোমার হবে।" সয়তান জান্‌ত মানুষের বাচ্চার দৌড় কত দূর। বলল, "বহুৎ আচ্ছা।" শেষ পর্য্যন্ত সয়তান ফাউস্টের সঙ্গে পার্‌ল না। ফাউস্ট বলে, "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে।" কিছুতেই তার তৃপ্তি নেই। "নেতি, নেতি।" একশো বছর বয়স হল, তবু সে নিরলস, নিত্য উদ্যত। একটু আরাম কি বিশ্রাম তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থাণু করল না। তার অন্তহীন চলার মাঝখানে এল মৃত্যু। এমন মানুষের আত্মার উপর কি সয়তানের কর্ত্তৃত্ব সম্ভব না সঙ্গত ?

তবু সে স্বর্গে যেতে পারে না। স্বর্গে যাবার পক্ষে তার যোগ্যতা যথেষ্ট নয়। সে পাপে আট্‌কে থাকেনি বটে, কিন্তু পাপের জন্য সে অনুতপ্ত নয়। পুণ্যের প্রতি সে একদিন আকৃষ্ট হয়েছিল, পুণ্যবতীতে অনুরক্ত হয়েছিল, সয়তানের প্রেরণায় সে পুণ্যশীলাকে ভ্রষ্টা করে পলায়ন করেছিল! তার সেই প্রিয়া তার হয়ে প্রার্থনা কর্‌ল কুমারী-জননীর সকাশে, কুমারী-জননীর

করুণাকে তার প্রতি উন্মুখ করল, ভাগবত করুণায় হল ফাউস্টের স্বর্গ লাভ।

এইখানে Goethe-র "ফাউস্টের" বিশিষ্টতা। ফাউস্টের আখ্যানের মধ্যে গ্রেচেনকে—কল্যাণীকে, সতীকে—প্রক্ষিপ্ত করলেন তিনিই। বিবর্ত্তনের মধ্যে এই তাঁর প্রবর্ত্তন। এর দ্বারা বিবর্ত্তনের সমাপ্তি ঘটল, ফাউস্টের পরিণাম হল চিরকালের সর্ব্ব মানবের অভিলষিত।

এ ছাড়া তিনি আখ্যানটিকে যথেচ্ছ পল্লবিত করলেন। অর্দ্ধ শতাব্দীকাল তাঁর দ্বারা পল্লবিত হতে হতে আখ্যানটি হয়ে উঠল উপলক্ষ মাত্র। মানবাত্মার মহানিয়তিকে সূত্র করে গ্রথিত হল রাজনীতি, অর্থনীতি, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, করুণাতত্ত্ব, সৃষ্টিবাদ, বিবর্ত্তনবাদ, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানব-শিশু-নির্ম্মাণ, সমুদ্র-শোষণ করে ভূখণ্ডবিস্তার ইত্যাদি প্রাচীন ও আধুনিক ভাবনা। Goethe-র "ফাউস্ট" যেন একখানি মহাভারতসার।

লোকসাহিত্যকে সাহিত্যে—প্রাকৃতকে সংস্কৃতে—উন্নীত করবার উদাহরণ এই প্রথম নয়। কালিদাসের শকুন্তলা, শেক্‌স্‌পীয়ায়ের হ্যাম্‌লেট, প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডীসকল মূলতঃ লোকমনের কল্পনা। প্রতিভাশালীরা লোক-কল্পনার অসম্পূর্ণ আলেখ্যের উপর তুলিকা স্পর্শ করে তাকে চিরকালের মতো সম্পূর্ণ করে দেন। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা লোক-সত্যেরও মর্য্যাদা রক্ষা হয়, প্রতিভাশালীকেও কালের বিচার সম্বন্ধে সন্দিহান হতে হয় না। আমার একার জিনিস সকলের হাতে দিলে আমাকে ঝুঁকি

নিতে হয়, কে জানে হয়তো ওরা আমার অসাক্ষাতে ওর তত্ত্ব নেবে না। সকলের ঘরের জিনিস আমার হাত দিয়ে ছুঁয়ে ফিরিয়ে দিলে সকলের হয়ে থাক্‌বে—উপরন্তু আমার হয়ে থাক্‌বে। কালিদাস বা শেক্‌স্‌পীয়ার বা Goethe যদি গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিজের হাতে বানাতেন তবে সেটা হত একটা এক্সপেরিমেণ্ট্, যার কাজ শাড়ীর পাড়ে ফুল তোলা তার পক্ষে শাড়ী বোনার মতো। অনাবশ্যক শক্তিক্ষয় তো হতই, তার পর সে এক্সপেরিমেণ্ট কখনোই নিপুণ হস্তের নির্ম্মিতি হত না। প্রতিভাশালীদেরও অধিকারের সীমা আছে। সীমার বাইরে গিয়ে শক্তিক্ষয় কর্‌তে তাঁরা স্বভাবত পরাঙ্‌মুখ। অবশ্য সীমার অর্থ কৃত্রিম গণ্ডী নয়। সীমা হচ্ছে স্বধর্ম্মের সীমা।

বহু জনের পায়ে চলার পথ বহু দিনের পরীক্ষিত। নিজের জন্য স্বতন্ত্র করে নূতন একটা পথ না কেটে সেই পথে চল্‌তে প্রতিভাশালীদের দ্বিধা নেই। তাঁরা জানেন যে তাঁদের ব্যবহারের দরুণ প্রাচীন পথ চির-নবীন বলে মনে হবে। তাঁদের স্বীকৃতির দরুণ গ্রাম্য পথ রাজপথ বলে গণ্য হবে।

Goethe-র "ফাউস্ট" কাব্য কিম্বা উপন্যাস না হয়ে নাটক হল কেন? কাব্যের প্রাণ বেদনা, উপন্যাসের প্রাণ বিবরণ, চিত্রের প্রাণ বর্ণনা, নাটকের প্রাণ সঙ্ঘটন। লোকচিত্তের ফাউস্টে বেদনার সূচনা করলেন Goethe স্বয়ং—গ্রেচেনের প্রেমে, বিষাদে, উন্মাদে। কিন্তু কাব্যের পক্ষে সেই যথেষ্ট নয়; বিষয়ের মর্ম্ম নয় সে। আর উপন্যাসের পক্ষে যা প্রাণস্বরূপ তা ক্রিয়া

নয়, ক্রিয়ার বিবরণ। লোকচিত্তের ফাউস্ট ক্রিয়ারত। তাই ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোজনা নিয়ে Goethe-র "ফাউস্ট" হল নাটক। তার সবগুলি বাইরের ঘটনা নয়। বাইরের যেগুলি সেগুলি যথাযথ নয়। কোথায় ঘট্‌ছে, কবে ঘট্‌ছে—এ সমস্ত গৌণ। ঘট্‌ছে—এইটে মুখ্য। ফাউস্ট তো মধ্যযুগের মানুষ। সে ধরে রাখল প্রাগৈতিহাসিক হেলেনাকে। তাদের যে সন্তান হল সে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড় হয়ে উঠ্‌ল, উড়তে গিয়ে মারা গেল। যেন বাস্তব নয়, ইন্দ্রজাল। যাঁরা সাধারণ নাটকের মতো করে "ফাউস্ট" পড়্‌বেন তাঁরা বাস্তব ও ইন্দ্রজাল এর একটার থেকে অপরটাকে পৃথক না কর্‌তে পেরে উদ্‌ভ্রান্ত হবেন। ইন্দ্রজালের গুণ তা অসম্ভবকে সম্ভব বোধ করায়। দেশকালের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। রূপকথা ও ইন্দ্রজাল, এদের জাত এক। লোকচিত্তের ফাউস্ট তো ঐন্দ্রজালিক, তার কাহিনী রূপকথা। সয়তান যে ভদ্রলোক সেজে এল এ যদি বিশ্বাস হয় তবে হেলেনা ও ফাউস্ট যে মিলিত হল ও সেই মিলন যে সদ্যফলপ্রদ হল এতে অবিশ্বাস অরসিকত্ব।

বহির্বিশ্বে ও অন্তর্বিশ্বে যে দুটি—ও দুই জড়িয়ে একটি—ঘটনা-পরম্পরা রয়েছে সেই ঘটনা-পরম্পরা সম্বন্ধে বিশেষ বোধ না থাক্‌লে "ফাউস্ট" কিম্বা কোনো বিশুদ্ধ নাটক বোঝা যায় না। সাধারণতঃ অভিনয় আমরা দেখি উপন্যাসের। পড়ি আমরা কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে গল্প। তার সঙ্গে থাকে ছবি মেশানো। ইদানীং ছবির ভাগ বেড়েছে। সাজ-আসবাব আলো ইত্যাদির

উপর থাকে চোখ আর কথাবার্ত্তার দিকে যায় কান। এর মধ্যে নাট্যবোধ কোথায়? স্টেশনে পৌঁছতে একটি মিনিট দেরি হয়ে গেছে, সাম্‌নে দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে, কিছুই করতে পরছিনে, অনড় হয়ে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছি, নিজের এই অসহায়তা মন্দও লাগছে না, বুক যেন ট্রেনের চলার সঙ্গীতে তাল দিচ্ছে— এই তো নাট্যবোধ।

পুত্তলিকার অভিনয় Goethe-র আশৈশব প্রিয় ছিল। এক অদৃশ্য হস্ত ঝুলন্ত পুত্তলীদের চালন করছে, তাদের মুখের কথা অপরে বলে যাচ্ছে, তাদের অঙ্গভঙ্গী কৌতুককর অথচ মুখভাব অবিকৃত। চরিত্রের বিকাশ নেই, কিন্তু ঘটনার লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্যাভিমুখিত্ব নাটকের ধর্ম্ম। গল্পেরও এটা একটা গুণ, কিন্তু গল্পের ধর্ম্ম তার বিস্তার, তার অপ্রাসঙ্গিকতা। পাকা কথকরা কি কিছুতে গল্প শেষ করতে চান্? কিম্বা গল্পের শেষটা ফাঁস করে দিতে? নাটকের শেষ কিন্তু আন্দাজ করা যায়। তা জেনে নিয়েও আমরা নাটক দেখ্‌তে কম আগ্রহী হইনে। এর প্রকৃত কারণ আমরা নিজকে ছেড়ে দিয়ে অসহায় ভাবে ভেসে যেতে ভালবাসি, বাঁচি আর মরি। ভয়ানক ভিড়ের মধ্যে পড়ে পিছনের চাপে আপনা-আপনি এগিয়ে যাবার রোমাঞ্চ আমাদের অস্থির করে। তাই ভিড় দেখ্‌লেই ভিড়ে যাই। বিশুদ্ধ ঘটনার টান যেন সমুদ্রের অন্তঃস্রোতের গ্রাস। রক্ষা নেই জেনেও নিজেকে সাম্‌লাতে পরিনে।

"ফাউস্টে" অনেক রকম অনেক ভিড়। নাগরিকদের উৎসব,

ডাকিনীদের শিবরাত্রি (walpurgis night), পরীরাজ্যের স্বপ্ন, মহারাজসভা, পারিষদগণের ছদ্মবেশবিলাস, পৌরাণিক গ্রীসের শিবরাত্রি, হেলেনার কোরাস, রাজশিবির, কুমারী-জননীর আশ্রম—প্রত্যেকটিকে অগণিত ব্যক্তির আবর্ত্তন, গতিচাঞ্চল্য, কলগুঞ্জন। এদের বিচিত্র সত্তাও ঘটনার সামিল। ফাউস্ট এদের মধ্যে পড়ে যেন আপনা-আপনি এগিয়ে চলেছে। সাথী মেফিস্টোফেলিস—সয়তান। তার কাজ হল কথায় কথায় ব্যঙ্গ, উপহাস, অবজ্ঞা, কুৎসিত সমালোচনা।

"ফাউস্টের" দুই প্রকার ব্যাখ্যা হতে পারে—একটি তৎকালীন, অন্যটি নিত্যকালীন। তৎকালীন ব্যাখ্যাটি এই। মধ্যযুগের মানব থিওলজির তত্ত্বকেই সত্য বলে বিশ্বাস করত। সেই বিশ্বাস তাকে একান্ত আশ্বাস দিত। যাহা নাই বাইবেলে তাহা নাই ধরাতলে। এমন সময় রিনেসেন্স এসে তার মনে জাগিয়ে দিল সৌন্দর্য্যের ধ্যান, জ্বালিয়ে দিল অনির্ব্বাণ সংশয়। সে যে কত পুঁথি পড়্‌ল তার সুমারি হয় না। এত পড়েও যার দিশা পেল না তার জন্য ভানুমতী শিখ্‌ল, যে পন্থা দুর্গম তাকে আরব্য উপন্যাসের ভৌতিক আসনে বসে আশু অতিক্রম কর্‌বার চেষ্টা দেখ্‌ল।

সংশয়ের নাম সয়তান। সয়তান হচ্ছে জিজ্ঞাসা, চ্যালেঞ্জ, বিদ্রোহ, ছিদ্রান্বেষ, অভিমান। সয়তানকে গোলাম করে, গুরু করে, মধ্যযুগের মানব আধুনিক হয়ে উঠল। হল বৈজ্ঞানিক, হল যন্ত্ররাজ, ছেঁচল [illegible] (সুয়েজ পানামা) খাল, আশা



রাখল আকাশে ওড়্বার, অভিপ্রায় কর্‌ল মানবশিশু নির্ম্মাণের। সম্ভাবনার অবধি নেই, আধুনিক মানব কোন্‌খানে থাম্‌বে? কত দূরে গিয়ে বল্‌বে, এই আমার সামর্থ্যের সীমানা, এই পর্য্যন্ত জয় করে আমি নিশানা রেখে দাঁড়ি টানলুম? আধুনিক মানব জীবনকর্ম্মে ক্ষান্তি না দিতেই আসে মৃত্যু। মৃত্যুর পর কি সে অনুতাপে দগ্ধ হবে? গ্লানি বোধ করবে, লজ্জিত হবে? না। যদিও সে স্বর্গকামনা করেনি, ভগবানকে ডাকেনি, তবু সেও ভাগবত করুণা থেকে বঞ্চিত নয়। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উন্নতমনা, নিরলস, নিরাসক্ত। সে তো ঊর্দ্ধাভিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, কেউ কি তার হাত ধরে তাকে তুলে নেবে না? নেবে।

মানুষ আপন চেষ্টায় ত্রাণ পেতে পারে না, তাকে ত্রাণ করবার জন্য স্বর্গ থেকে করুণা নেমে আসে। এমনিতে কোনো ব্যক্তি করুণার যোগ্য নয়, শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরাও নন্। করুণা কেউ দাবী করতে পারে না; সেটা প্রভুর খুশির খয়রাৎ। এল খ্রীস্টীয় করুণাতত্ত্ব, grace-এর কথা। এই তত্ত্বের সঙ্গে Goethe একরকম সন্ধি কর্‌লেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে করুণা হল ভগবানের অহেতুক দান, তার পাত্রাপাত্র নেই, তবু সচেষ্ট ব্যক্তি তার আশা রাখ্‌তে পারে। ফাউস্টের মতো কর্ম্মী তার দ্বারা অবশেষে ত্রাণ লাভ করে থাকে। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।" ফাউস্ট তাই কর্‌তে কর্‌তে ঠিক একশো বছর বেঁচেছিল। তার একটা গতি না কর্‌লে খ্রীস্টীয় ভগবান আধুনিকদের নিকট মুখ দেখাবেন কী করে?

ক্রিশ্চিয়ানিটীর সঙ্গে তো এই মর্ম্মে সন্ধি হল। কিন্তু মধ্যযুগের মানবের ছিল তে-টানা। টান্‌ছিল তাকে অযুত সম্ভাবনা-বিশিষ্ট ভবিষ্যৎ—প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব, যন্ত্রকৌশল, বিজ্ঞানদৃষ্টি, পার্থিব হিত। টান্‌ছিল তাকে মৃত্যুর পরপারে অতিমর্ত্ত্য পুণ্য, জাগ্রত করুণা, চির নবীন কলেবর, অক্ষয় স্বর্গ। আবার উদ্বেগ-ভাবনাশূন্য স্বাস্থ্য-সুষমা-সামঞ্জস্যের প্রতি. নীতিহীন দ্বিধাহীন কৃত্রিমতাহীন যৌবনের প্রতি, মানবজাতির স্বর্ণাভ অতীতের প্রতিও তার টান ছিল। ফাউস্টের তিনদিকে তিন আকর্ষণ—সয়তান, গ্রেচেন, হেলেনা। তিন জনকেই স্বীকার করে তিনজনের সঙ্গে তিনরকরম বোঝাপড়া করা দরকার ছিল।

সয়তান যদি হয় সংশয়ের প্রতিরূপক, গ্রেচেন যদি হয় ক্রিশ্চিয়ানিটীর, তবে হেলেনা হচ্ছে মানবসৌন্দর্য্যের। আজো ইউরোপের ধ্যানে হেলেনার রূপই চিরন্তনী সুন্দরীর রূপ। ভারতবর্ষে তার তুলনীয় নেই। আমাদের রূপের আদর্শ অপ্সরাতে বা দেবীতে নিবদ্ধ রয়েছে, মানবীতে রক্তমাংস পরিগ্রহ করেনি। হেলেনার কথায় একমাত্র শ্রীরাধার কথাই মনে আসে, কিন্তু শ্রীরাধাতে প্রমূর্ত্ত হয়েছে আমাদের প্রেমের আদর্শ—যার তুলনীয় ইউরোপে নেই।

মধ্যযুগের মানব হেলেনাকে উপেক্ষা করে জীবনকে সর্ব্বাঙ্গীন করতে পারত না। যারা হেলেনার আহ্বান শুন্‌ত তাদের ইহকাল-পরকাল যেত, আর যারা শুন্‌ত না তারা ছিল অবিদগ্ধ,

অনাগরিক। ফাউস্ট হেলেনার সঙ্গে মিলিত হল অথচ সেই মিলনে ভ্রমরের মতো পদ্মসমাধি পেল না। হেলেনাকে অতিক্রম করে গেল। সৌন্দর্য্য ও সন্ধিৎসা সঙ্গত হয়ে যার জন্ম দিল সে কথা শোনে না, শূন্যে লাফ দিতে দিতে ছুটে চলে, সে চায় সংগ্রাম, সে চায় যশ। প্রাচীন গ্রীস ও মধ্যযুগীয় ইউরোপের সন্তান দুরন্ত আধুনিকতা। তার কপালে আছে অপঘাত। কিন্তু কী বিমোহন তার তারুণ্য!

"ফাউস্টে"র নিত্যকালীন ব্যাখ্যা তাকে জাতিনির্ব্বিশেষে সর্ব্বমানবের করেছে। সে আমাদেরও।

মানুষের মধ্যে যে বহির্ম্মুখীনতা আছে তাকে কেউ বলেছে সয়তান, কেউ বলেছে মার, কেউ বলেছে রিপু। তার সঙ্গে মানুষের যেন দ্বন্দ্বের সম্পর্ক। তাকে দমন করা, তার উপর জয়ী হওয়া, এই যেন মানুষের সাধনা। এই সাধনার মধ্যে সত্য যতটুকু থাকুক, একে অবলম্বন করলে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে একাসনে বসে রইতে হয়, প্রকৃতির রূপ গন্ধ গান হয় নিস্ফল নিরর্থক। এ সাধনায় সিদ্ধি যদি বা আসে তবে যেন pyrrhic victory, তাতে প্রাপ্তির ভাগ ক্ষুদ্র।

এ ছাড়া অন্য এক সাধনা যে সম্ভব তা আমাদের জানা ছিল না। এতে পাপেরও স্থান আছে প্রলোভনেরও মূল্য আছে, সয়তানকে এ সাধনা শত্রু বলে না। কারুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব নেই, কারুর উপর ভয় নেই, সকলে সহায়। সৌন্দর্য্যকে সম্ভোগ করতে হয়, বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে হয়, প্রবৃত্ত হতে হয়

নব নব অসাধ্যসাধনে। এই সাধনার মন্ত্র—এক এক করে ছাড়িয়ে চল, আটকে থেকো না। মানবাত্মার আসক্তি সাজে না, বিশ্রাম নেই, আরাম ভয়াবহ। ভোগ কর কিন্তু ভোগের পরক্ষণে ত্যাগ কর। ত্যাগের বেদনাকে এড়াতে চেয়ো না। ভালোও যথেষ্ট ভালো নয়। ভালোও আজ বাদে কাল ভালো নয়। ভালো মন্দ দুইই নিতে হবে, ছাড়তে হবে। পাপ কর, কিন্তু পাপে জড়িয়ে যেয়ো না। প্রলোভনের অনুবর্ত্তন কর, কিন্তু অধীন হয়ো না। এইভাবে চরিত্র পাক্ পূর্ণতা, চরিত্রবলের দ্বারা অক্ষত থাক। জীবন বৈচিত্র্যে ভরে উঠুক, উপলব্ধিতে আসুক সমৃদ্ধি, সত্যের সঙ্গে পরিচয় হোক সত্যতর।

মানুষ যদি কোনোখানে বাঁধা না পড়ে, ক্ষান্তি না দেয়, তবে প্রকৃতির নিয়মে তার মৃত্যু হলেও মৃত্যুতে তার বিরতি নেই। তার চলা এবার মর্ত্ত্যে নয়, অতিমর্ত্ত্য লোকে। এবার তার সাথী সয়তান নয়, শাশ্বতী। এই বিশ্বের অন্তর্লোক-বাসিনী যে নারী মর্ত্ত্যলোকে মানব সঙ্গিনী হতে পারল না, মর্ত্ত্যে যার পরিসর সঙ্কীর্ণ বলে অসীমের অভিসারক যাকে পরিত্যাগ করল, স্বর্গে সেই নারী ভাগবত করুণাবাহিনী, তারই নিত্য প্রার্থনা ভাগবত করুণাকে আবাহন করে আন্‌ল, গঙ্গোদকের মতো মানবের শীর্ষে ছিটিয়ে দিল, মানব ধরল দিব্য কলেবর। একটি কেন্দ্রে স্থিত হয়ে সে করেছে আপনাকে নিস্পৃহ, সে রেখেছে মুহূর্ত্তের প্রেমকে চিরন্তন করে, তার তপস্যা তার প্রিয়তমকে ঘিরে। সেই কল্যাণরূপিনী যদি প্রদর্শক না হয়

তবে মানব যে মানব-অভিজ্ঞতার চরমে গিয়ে—মৃত্যুতে উপনীত হয়ে—অমৃতের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, পায়চারি কর্‌তে থাক্‌বে, প্রবেশ পাবে না। নারী তাকে ছাড়পত্র এনে দেয়, ভিতরে নিয়ে যায়, উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধতর লোকে ক্রমাগত নিয়ে চলে। সেই নিরুদ্দেশ উর্দ্ধ যাত্রাই নিরন্তর স্বর্গভোগ। সে ভোগ নারীসমন্বিত।

পরম* সঙ্গিনীর প্রশস্তিতে Goethe-র "ফাউস্ট" সমাপ্ত হল। স্থান বৈকুণ্ঠ, কাল চিরকাল। প্রশস্তিকারকরা স্বর্গীয় চারণ।

"All things corruptible
Are but reflection.
Earth's insufficiency
Here finds perfection.
Here the ineffable
Wrought is with love,
The Eternal-Womanly
Draws us above."

(১৯৩৩-৩৪)

* Goethe's Faust. Translated by A. G. Latham (Everyman's Library).

"সমর ও শান্তি"

(১)

দুটি কথায় জীবন হচ্ছে সংগ্রাম ও বিশ্রাম।

ভারতীয়রাও এমনিতর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ। কিন্তু ইউরোপীয়রা বলতে পারেন জীবনের প্রতি অবস্থায় তো দুঃখ সুখ জড়িয়ে রয়েছে, ওদের পারম্পর্য্য কোথায়? পরম্পরা যদি থাকে তবে তা সংগ্রামের ও বিশ্রামের। সংগ্রামে যে কেবলই দুঃখ তা নয়, আর বিশ্রাম যে অবিমিশ্র সুখের তাও নয়। সুখদুঃখ-নিরপেক্ষভাবে সংগ্রাম হচ্ছে সংগ্রাম এবং বিশ্রাম হচ্ছে বিশ্রাম। এবং দুই মিলিয়ে জীবন যদি হয় পদ্য তবে 'সংগ্রাম' ও 'বিশ্রাম' বোধ হয় 'দুঃখ' ও 'সুখ' অপেক্ষা গাঢ়তর মিল।

ইউরোপের ইতিহাস—ইউরোপনির্দ্দিষ্ট অর্থে মানবের ইতিহাস—মাত্র দুটি শব্দের উলটপালট খেলা। সমর ও শান্তি। কখনো রাজাতে রাজাতে, কখনো রাজাতে প্রজাতে, কখনো বা নেশনে নেশনে সমর যেন একটার পর একটা ঢেউয়ের ভেঙে পড়া। আর শান্তি যেন সেই ঢেউয়ের পা টিপে টিপে ফিরে যাওয়া। এ খেলা ফুরায় না, ফুরাবার নয়।

টলস্টয় প্রণীত "সমর ও শান্তি" নপোলিয়নীয় যুগের ইতিহাস। ইতিহাসের আক্ষরিক অর্থে নয়। তাই উপন্যাস-

পর্য্যায়ভুক্ত। অথচ সাধারণ উপন্যাসের মতো এক জোড়া নায়কনায়িকার বৃত্তান্ত নয়। এর নায়ক বল নায়িকা বল সে হচ্ছে স্বয়ং রাশিয়া, রাশিয়ার প্রাণমনসম্মান। অথবা দেশ কালের সীমার মধ্যে স্থিত অসীম মানববংশ। ইতিহাসের সত্যকার বিষয় যদি হয় মানবভাগ্য তবে এই উপন্যাস হচ্ছে ইতিহাসের ভগ্নাংশ এবং বিষয় এর দেশকাল-রঞ্জিত মানবভাগ্য। এর অসংখ্য পাত্রপাত্রী হচ্ছে মানব-করতলরেখা।

১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে রুশ সৈন্যেরা অস্ট্রিয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আউস্টারলিৎসের রণক্ষেত্রে। হেরে যায়, কিন্তু 'হেরে গেছি' এই ভ্রান্তিবশত। প্রকৃতপক্ষে তাদের হারবার কথা ছিল না। ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের সঙ্গে রুশ সম্রাট আলেক্জাণ্ডারের সাক্ষাৎকার ঘটে, বন্ধুতা হয়। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে সেই মৈত্রী পর্যবসিত হল শত্রুতায়। নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন, কিন্তু রুশ সেনাপতি কুটুজো দেখেন যে প্রতিরোধ করলে নিশ্চিত পরাভব। নেপোলিয়নের সৈন্যরা অবাধে মস্কো প্রবেশ করল, কিন্তু মস্কো জনশূন্য। একটিও রাশিয়ান তাদের সহযোগিতা করতে চাইল না। কেউ জানে না কে লাগিয়ে দিল শহরে আগুন। এরা বলে ওরা লাগিয়েছে। ওরা বলে এরা লাগিয়েছে। লুটপাট করে ফরাসীরা স্থির করল ফেরা যাক। কিন্তু যে বাঘ খাঁচায় ঢুকে পেট ভরিয়েছে ছাগ মাংসে তারই মতো দশা হল তাদের। যতটা পথ এসেছিল ঠিক ততটা পথ ফেরার মুখে বহু গুণ বোধ

হল। কুটুজো ইচ্ছা করলে রাস্তায় হানা দিয়ে তাদের নির্ব্বংশ করতেন। কিন্তু অনাবশ্যক রক্তপাতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না, তারা যখন স্বেচ্ছায় রাশিয়া ত্যাগই করছে। তাঁর কোনো কোনো সৈনিক কসাকদের দলপতি হয়ে চোরের উপর বাটপাড়ি করল। এইসব গেরিলা যুদ্ধে ও শীতে বরফে খাদ্যের অভাবে নেপোলিয়নের গ্রাঁদ আর্মে কাহিল হয়ে পড়ল, সৈন্যদের অল্পই বাঁচল। তাও হল পথি বিবর্জিত। নেপোলিয়ন চুপি চুপি দিলেন মস্ত এক লম্ফ!

এই হল কাঠামো। সাধারণ ঔপন্যাসিক হলে তাঁর পাত্রপাত্রীদের দিয়ে বড় বড় কাজ করাতেন। নতুবা যারা বড় বড় কাজ করেছে বলে ইতিহাসে লেখে তাদেরকেই করতেন পাত্রপাত্রী। জাতীয় গৌরবের রঙে সমস্তটা হত অতিরঞ্জিত। সাধারণ ঐতিহাসিক হলে ঘটনার পশ্চাতে দেখতেন মানুষের ইচ্ছা, মানুষের পরিকল্পনা, মানুষের দূরদৃষ্টি। সেনাপতিদের চাল দেওয়া, সৈনিকদের বোড়ের মত চলা, অধিককৌশলীর জয়লাভ। পরাভূত পক্ষের ঐতিহাসিক ধরতেন উঠানের দোষ—নেপোলিয়নের সর্দ্দিকে করতেন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। ঘটনাচক্রে কুটুজো মস্কো রক্ষা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে সাব্যস্ত করলেন তাঁর পরামর্শ-পরিষদের সম্পূর্ণ অমতে। আর রোস্টোপশিনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও শহরের লোক যে যেদিকে পারে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল, নেপোলিয়ন থাকতে সেখানে ফিরল না। জাতীয় ঐতিহাসিক হলে টলস্টয় বলতেন, এ কি আমরা না

ভেবেচিন্তে করেছি? আমরা অনেকদিন থেকে মাথা খাটিয়ে ঠিক করেছিলুম যে নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়ে দেশের ভিতরের দিকে টেনে আনব ও মস্কো খালি করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখব।

টলস্টয় ঋষি। তিনি তাঁর দিব্য দৃষ্টিযোগে প্রত্যক্ষ করলেন ঘটনা কেমন করে ঘটল, কেমন করে ঘটে থাকা সম্ভব। যারা খেলা করে তারা জানে কার কত দূর দৌড়। কিন্তু যুদ্ধে অপর পক্ষের সামর্থ্য পরিমাপ করবার কোনো ধ্রুব মান নেই। যারা লড়াই করে তাদের ঐটেই একমাত্র ভাবনা নয়, তারা সবাই বীরও নয়। তাদের নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট ঈর্ষাদ্বেষ, তাদের কারুর মনে পড়ছে ঘরসংসার, কেউ গণনা করছে কবে মাইনে পাওয়া যাবে। সেনাপতিদের এক একজনের এক এক মত, তাদের সবাইকে এক মনে কাজ করানো প্রধান সেনাপতির নিত্য সমস্যা। পদাতিকদের অনুপ্রেরণা জয় গৌরব ততটা নয় যতটা লুটতরাজ। মরণের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েও বীরপুরুষেরা লুটের মাল আঁকড়ে থাকে। যুদ্ধ জিনিসটা একজনের হুকুমে হয় এর মত ভ্রান্তি আর নেই। যুদ্ধ হয় একবার কোনো মতে সুরু করে দিলে আপনাআপনি। থামে হয়তো একটা উড়ো কথায়। কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, "আমরা হেরে গেছি।" অমনি সবাই ভঙ্গ দিল।

কেন যে যুদ্ধ হয়, কেন যে মানুষ মারে ও মরে, কী যে তার অন্তিম ফল টলস্টয় তার সম্বন্ধে অজ্ঞেয়বাদী। নেপোলিয়ন হুকুম

করলেন, 'যুদ্ধ হোক', আর অমনি যুদ্ধ হল এই সুলভ ব্যাখ্যায় তিনি সন্দিহান। নেপোলিয়ন নিয়তির বাহন, তাও একটা ঐরাবত কি উচ্চৈঃশ্রবা নন, প্রতিভা তাঁর নেই। মস্কোতে তিনি আগাগোড়া নির্ব্বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। সেই শহরে খাদ্য মজুত ছিল ছয় মাসের। কিন্তু নেপোলিয়ন তার হিসাব রাখলেন না। সৈন্যরা লুটপাট করে তছনছ করল। মস্কোর ধনসম্ভার তাদের লোভ জাগিয়ে তাদেরকে এত দূর দেশে এনেছিল, সেই লোভের তাণ্ডব নাচ চলল। নেপোলিয়ন মোরগের মতো নিশ্চিত জানতেন যে নাগরিকরা তাঁর লম্বা চওড়া ইস্তাহার পড়ে ফিরবে, আবার দোকানপাট বসাবে। গ্রামিকরা আসবে মাছ, তরকারি বেচতে। তাদেরকে তিনি ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন যে, যুদ্ধে যেমন তিনি অপরাজেয় শান্তিকালেও তেমনি তিনি প্রজারঞ্জক।

রাশিয়ার জনগণকেই টলস্টয় দিয়েছেন সাধুবাদ। তারা কোনো ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা চালিত হয়নি। তারা পরস্পরের পরামর্শ নেয়নি। তারা অন্তরে উপলব্ধি করল নিয়তির অভিপ্রায়। তাই মূঢ় রোস্টোপশিনের অনুজ্ঞায় কর্ণপাত না করে শহর ছেড়ে দিল। শহরে আগুন দিল কে তা কিন্তু বলা যায় না। হয়তো রাশিয়ানরা, হয়তো ফরাসীরা। যেই দিক সে নিয়তির ইঙ্গিতে দিয়েছে। বোঝেনি কিসের ফল কী দাঁড়াবে!

শত্রুর সঙ্গে অসহযোগ করব, ফিরব না মস্কোতে এই যে তাদের অপ্রতিরোধের সঙ্কল্প এও কারুর নির্দ্দেশে বা শিক্ষায় নয়। এও তারা একজোট হয়ে পরস্পরের পরামর্শ নিয়ে করেনি। এ

তাদের প্রত্যেকের অন্তরের আদেশ! এমন যদি না হত তবে সম্রাট বা সেনাপতিদের ইচ্ছা নেপোলিয়নের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রলয় বাধাত, প্রলয়ঙ্করের করতালি তো এক হাতে বাজে না।

শেষজীবনে টলস্টয় যে জনগণের স্বভাববিজ্ঞতায় আস্থাবান হবেন, অপ্রতিরোধতত্ত্বের গোস্বামী হবেন, তার পূর্ব্বাভাস তাঁর যৌবনের এই গ্রন্থেও লক্ষ্য করা যায়। নামহীন পরিচয়হীন মহাজনতায় আপনাকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর সাধনা। পারেননি, এমনি উগ্র তাঁর ব্যক্তিত্ব। বদ্ধমূল আভিজাত্য উন্মূল হল না। তবু তাঁর দানবিক প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হয়নি। দেশান্তরে রূপান্তর পরিগ্রহ করেছে ভারতের সত্যাগ্রহে, গান্ধীজীর জীবনাদর্শে। টলস্টয়কে দ্বিখণ্ডিত করে কেউ নিয়েছে তাঁর যৌবনের অনবদ্য শিল্পিত্ব। কেউ নিয়েছে তাঁর পরিণত বয়সের অপ্রতিরোধতত্ত্ব।

কিন্তু এই যে তাঁর জনগণের সহজ বিচারের প্রতি আস্থা এই তাঁর উভয় বয়সের, উভয় প্রতিকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয়ের সঙ্কেত। শিল্পি-ঋষি ও সাধু-ঋষি মূলতঃ ঋষি। তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বের কোন রহস্য ধরা পড়েছে? ধরা পড়েছে এই যে, যাবতীয় ঘটনার যথার্থ পাত্রপাত্রী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা নন। নামপরিচয়হীন নির্বিশেষ জনতা যা করে তাই হয়। এবং যা করে তা নিয়তির চালনায়। নিয়তি অন্ধ নয়, খেয়ালী নয়। তার ব্যবহারে আছে নিয়ম। যেমন পৃথিবীর ঘূর্ণন আমাদের

অনুভূতির অতীত বলে আমরা একদা তাকে স্থাণু মনে করেছিলুম তেমনি নিয়তির ইচ্ছায় কাজ করতে থেকেও আমরা তার সম্বন্ধে অচেতন, আমরা ঠাওরাচ্ছি আমরা ইচ্ছাময়।

সমর থেকে ওঠে নিয়তির কথা। তেমনি শান্তি থেকে ওঠে প্রকৃতির। বিচিত্র সংস্কারের ধারাবাহিকতায় কত রস, কত রূপ। যুদ্ধ চলেছে নেশনে নেশনে। কিন্তু অলক্ষিতে বালিকা হয়ে উঠছে বালা, বালা হয়ে উঠছে নবযুবতী। অন্তরালে শীতের সূর্য্য সুধাবর্ষণ করে যাচ্ছে, আকাশ ঘন নীল। কে বলবে যে এই সুন্দরী ধরণী একদিন হবে রণক্ষেত্র, বারুদের ধূমে ও গন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ পশুপক্ষীর হবে শ্বাসরোধ, পাতা ও ফুল যাবে বিবর্ণ হয়ে ? টলস্টয়ের এই গুণকে কেউ কেউ আখ্যা দিয়েছেন আইডিল, সুখসরলতার ছবি। এক হিসাবে তা সত্য। সহজ, প্রসন্ন জীবন। বিশেষ অভাব অভিযোগ নেই। নেই তেমন কোনো দ্বন্দ্ব। কারুর অতি বড় সর্ব্বনাশ ঘটে না, জীবন-দেবতা সকলেরই শেষ নাগাদ একটা সদ্ব্যবস্থা করেন। কাউকে দেন সুমধুর মৃত্যু, মুখে হাসিটি লেগে থাকে। কাউকে রাখেন চিরকুমারী করে, নিজের নিষ্ফলতায় সন্তুষ্ট। কেউ আরম্ভ করেছিল বিশ্বের ভাবনা ভেবে। মরতে মরতে বেঁচে গেল। তারপর বিয়ে করল, সুখে থাকল।

আধুনিক পাঠকের এতটা শান্তি বিশ্বাস হবে না। তবে এটুকু পরিতোষ হবে যে পাপের পরাজয়, পুণ্যের জয় প্রতিপন্ন করবার অভিপ্রায় ছিল না ঋষির। আর এও না মেনে উপায়

নেই যে প্রত্যেকটি কাল্পনিক চরিত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ চরিত্রের মতো উৎরেছে। তার মানে ওরা আস্ত মানুষ, কবি ওদের দেখেছেন সকলের মাঝে, দেখিয়েছেন যথাযথরূপে। ওরা থাকলেও থাকতে পারত ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাসে থাকলে বিশ্বাস করতুম ওদের জীবনযাত্রার শান্তি।

কথা হচ্ছে সমরের মতো শান্তিকালেও টলস্টয় পড়েছিলেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ। সমরের যেমন নিয়তি, শান্তির তেমনি সহজ বিকাশ, বিশুদ্ধ অস্তিত্ব। দ্বন্দ্বের স্থান রণাঙ্গনে। গৃহে বড় জোর একটু মান অভিমান, সহজ কলহ। একটু ব্যঙ্গ, একটু রঙ্গ। রাগ হলে, বা রাগ হওয়া উচিত বলে মনে করলে, একটা ডুয়েল। তাতে মরেও না শেষ পর্য্যন্ত কোনো পক্ষ।

শান্তিও যে আজ আমাদের দিনে সমরের নামান্তর, প্রকারান্তর, বলে গণ্য হবে তা তো ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে সূচিত হয়নি। বিশেষতঃ রাশিয়ায়, এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের গণ্ডী কালচিহ্নিত। যেমন খাপ তেমনি তরবারি। তথাপি সেকালের চিন্তায় জমিদার ও চাষার সম্বন্ধ কেমন হবে সে জিজ্ঞাসা ছিল।

(২)

সমসাময়িক সমস্যার চেয়ে টলস্টয়কে ঢের বেশী আকুল করেছিল সনাতন জীবনরহস্য। কেন বাঁচব, কেমন করে বাঁচব,

বাঁচার মত বাঁচা কাকে বলে ? এর এক একটি প্রশ্নের উত্তর তিনি এক এক জনের চরিত্রে দিয়েছেন। মেয়েদের মধ্যে নাম করা যায় নাটাশার, মারিয়ার, সোনিয়ার, হেলেনের। পুরুষদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় য়্যাণ্ড্রুকে, পিটারকে, নিকোলাসকে। যাদের অগ্রাহ্য করলুম তারা কেউ উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা শতাবধি। এত রকম এত ব্যক্তি অন্য কোন গ্রন্থে আছে ? ডস্টয়েভ্স্কিও টলস্টয়ের পিছনে পড়ে যান।

নাটাশাকে আমরা প্রথম যখন দেখি তখন তার শৈশব সারা হয়ে গেছে অথচ সে কৈশোর উত্তীর্ণ হয়নি। দেখতে তত সুশ্রী নয়, বরং শ্রীহীন বলা যেতে পারে। কিন্তু রূপের অভাব পুষিয়ে দিয়েছে উচ্ছলিত প্রাণ। তখনো তার পুতুল খেলার অভ্যাস ভাঙেনি। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। তার সে হাসি সংক্রামক। এই মেয়ে বছর চারেক পরে হয়েছে ষোড়শী, ভাবাকুলা, সুদর্শনা। কিন্তু রয়েছে তেমনি প্রাণবতী। সামাজিক নৃত্যে সে এমন আনন্দ পায় যে তার নিষ্পাপ চিত্ত সকলের আনন্দ কামনা করে। তার উল্লাস যেন কোন অপ্সরার, তা দিকে দিকে সৃষ্টি করে উল্লাস। তার অখলতা, তার অকৃত্রিমতা, তার সরল মাধুরী তার প্রতি আকৃষ্ট করল য়্যাণ্ড্রুকে। য়্যাণ্ড্রু উচ্চপদস্থ, উচ্চবংশীয়, উচ্চমনা। বয়সেও বড়। দেশের মঙ্গলের নানা পরিকল্পনা ছিল তাঁর ধ্যান। কিন্তু তাঁর প্রথম বিবাহের স্ত্রী তাঁর উপযুক্ত সঙ্গিনী ছিলেন না। সামাজিকতার অশেষ তুচ্ছতায় তাঁর প্রতিভার অফুরন্ত খুচরা খরচ হয়েছিল, বাজে খরচ।

বিরক্ত হয়ে তিনি যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধের স্বরূপ দর্শন করে তাঁর তাতেও অরুচি ধরল। যাকে আদর্শস্থানীয় বলে বিশ্বাস করেছিলেন সেই নেপোলিয়নকে নিকট থেকে দেখে বীতশ্রদ্ধ হলেন। প্রশান্ত নীল আকাশের নীচে আহত হয়ে পড়ে থাকার সময় তাঁর মনে হল তাঁর বুদ্ধিগম্য যাবতীয় বিষয় অসার, সার কেবল ঐ অসীম বিশ্বরহস্য। এমন যে য়্যাণ্ড্রু তাঁরও নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছা করল নাটাশার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণপ্রবাহে ভেসে। তার নেই লেশমাত্র মলিনতা, সে ঝরণা। এক বছরের জন্য য়্যাণ্ড্রু দেশের বাইরে গেলেন, ফিরে এসে নাটাশাকে বিয়ে করবেন। এই এক বছরে নাটাশা তাঁর প্রতীক্ষায় অধৈর্য্য হয়ে উঠল। এল তার কুগ্রহ আনাতোল। ক্ষণিক উন্মাদনায় সে প্রতারকের কবলে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিল, বাধা পেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল। বেঁচে গেল। কিন্তু বদলে গেল। য়্যাণ্ড্রু দেশে ফিরে যা শুনলেন তাতে তাঁর জীবনের স্পৃহা লোপ পেল, নারীর কাছে তিনি কোনো রূপ মহত্ত্ব প্রত্যাশা করলেন না, এত দুর্ব্বল তারা। তিনি আবার গেলেন যুদ্ধে, এইবার মৃত্যু কামনা করে। আহত হয়ে আনীত হলেন, ঘটনাচক্রে নাটাশাদের আশ্রয়ে। মরণকালে তাঁর চিত্ত উদ্ভাসিত হল দিব্য ভাবে। তিনি ক্ষমা করলেন, তিনি ভালোবাসলেন, প্রাণীমাত্রকে, সংসারকে। তাঁর মনে ব্যর্থতার নিত্য খেদ রইল না। অনুতপ্তা সেবিকা প্রিয়াকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

নাটাশাকে তার শৈশব থেকে ভালোবাসত পিটার। লোকটা

কেবল যে লাজুক, ভালোমানুষ, কিম্ভুত কিমাকার, মাথাপাগলা তাই নয়, নামগোত্রহীন সত্যকাম। তাই কাউকে কোনোদিন জানায়নি ভালোবাসার কথা। হঠাৎ মারা গেলেন কাউণ্ট বেস্তুকো, উত্তরাধিকারী হল পিটার, বিরাট ভূসম্পত্তির তথা পদবীর। তখন তাকে লুফে নিল নাটাশাদের চেয়ে উদ্যোগ-সম্পন্ন, প্রতিপত্তিমান কুরাগিন বংশ। তার বিয়ে হল যার সঙ্গে সে অসামান্য রূপবতী, সোসাইটির উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, হেলেন। কোনো পক্ষে প্রেম নেই। বিভবের সঙ্গে সৌন্দর্যের বিবাহ। দুজনেই পরম অসুখী হল। হেলেন খুঁজল অমন অবস্থায় ওরূপ সমাজের রাণীমক্ষিকারা যা খোঁজে। আর বেচারা পিটার হল ফ্রীমেসন। চরিত্রকে দিন দিন উন্নত করতে চেষ্টা করল, বিশ্বকল্যাণ-ব্রত-রত। দোষের মধ্যে মদটা খায় অপরিমিত। তার সেই ভালোবাসা তার অন্তরে রুদ্ধ থাকে। নাটাশার সঙ্গে তার সহজ বন্ধুতা। নাটাশা তাকে সরল জন্তুটি বলে সখীর মতো বিশ্বাস করে। নেপোলিয়ন যখন রাশিয়া আক্রমণ করলেন পিটারের ধারণা জন্মাল যে, বাইবেলে যে রাক্ষসের বিষয়ে ভবিষ্য-দ্বাণী আছে নেপোলিয়নই সেই রাক্ষস এবং তাকে হত্যা করবে যে সে আর কেউ নয়, সে আমাদের পিটার, যে একটা বন্দুক ছুঁড়তে জানে না। পিটারের প্রয়াসের ফল হল শেষকালে এই যে পিটার অন্যান্যদের সঙ্গে ধৃত হয়ে প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায় সারি বেঁধে দাঁড়াল। তার চোখের সুমুখে মানুষ মরল ঘাতকের গুলিতে। তারও উপর গুলি চলবে এমন সময় তার প্রাণদণ্ড

মকুপ হল, সে চলল বন্দী হয়ে ফিরন্ত ফরাসীদের সাথে। কসাকদের সাহায্যে অন্যান্য বন্দীদের সহিত তাকেও উদ্ধার করল ডেনিসো ডোলোগো প্রভৃতি গেরিলা যুদ্ধের নায়ক। মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে, বহু লাঞ্ছনা সয়ে যে দুঃখ আমাদের পাওনা নয় সেই দুঃখকেও কেমন ভক্তির সহিত গ্রহণ করতে হয় তার দৃষ্টান্ত কারাটাইয়েভ নামক একটি পরম দুঃখী ঈশ্বরবিশ্বাসীর জীবনে প্রত্যক্ষ করে পিটারের গভীর অন্তঃপরিবর্ত্তন ঘটেছিল। সৌখীন মানবহিত আর তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করছিল না। সে পথ পেয়েছিল। বিষাদিনী নাটাশাকে বিয়ে করে—ততদিনে হেলেন মরেছিল—সে দস্তুরমত সংসারী হল। নাটাশা আবার সেই আনন্দময়ী। প্রকৃতি নিজে তাকে সহজ আনন্দ জোগায়, উদ্ভিদ্‌কে যেমন রস। সে কালক্রমে ফলভারাবনত পূর্ণবিকশিত পাদপের মতো প্রসারিত, সমৃদ্ধ হল। কে তাকে দেখে চিনবে যে এ ছিল একদিন তন্বী আলোকলতা! তবু তাই তার প্রাকৃতিক পরিণতি। তা নইলে যা হত সেটা তার বিকৃতি। নাটাশা টলস্টয়ের মানসী নারী। সে ভালো। কিন্তু সজ্ঞানে ও সাধনার দ্বারা নয়। শিক্ষার দ্বারা নয়। নীতির চুল চেরা তর্ক তার মনে ওঠে না। তার প্রাণ যা চায় সে তাই চায়। তার প্রাণ যা চায় তার ফলে অনর্থ ঘটলে সে তা ভোগে। নালিশ করতে যায় না।

য়্যাণ্ড্রুর বোন মারিয়া হচ্ছে কতক তার রূপহীনতার প্রতিক্রিয়ায়, কতক তার কঠোরস্বভাব জনকের তাড়নায়

তপস্বিনী। তার সমবয়সিনীরা যখন খেলা করছে, লীলা করছে, শিকার করছে দুই অর্থে, মারিয়া তখন জ্যামিতির পড়া তৈরি করছে আর করছে লুকিয়ে অধ্যাত্মচর্চ্চা। যা অমন দুঃখিনী হলে নারীমাত্রেই করে থাকে। আপনাকে ভাগবত জীবনের যোগ্য করছে নিষ্ঠার সহিত, বিবাহের তো প্রত্যাশা নেই। তা বলে আশা কি মরেও মরে! কতবার নিরাশ হল। অবশেষে নাটাশার ভাই নিকোলাস তার পৈত্রিক সম্পত্তির খাতিরে তাকে বিয়ে করল, অবশ্য বিয়ের আগে তাকে বিদ্রোহী প্রজাদের হাত থেকে উদ্ধার করে তার হৃদয় জিনে। তাদের বিয়ে বেশ সুখেরই হল। মারিয়ার দীর্ঘাচরিত সংযম ও সাধুতা তাকে শুদ্ধ সুবর্ণের আভা দিয়েছিল। তার রূপহীনতাকে ঢেকেছিল সেই আভা।

নিকোলাস নাটাশারই মতো প্রাণময়, তবে সহাস্য নয়, সুগম্ভীর। তার সব কাজে হাত লাগানো চাই, উৎসাহ তার অদম্য, ব্যগ্রতা তার মজ্জাগত। ঘোড়ায় চড়া, ঘোড়া খরিদ, তরুণ সৈনিকের ভাবনাশূন্য জীবনের হাজার ভাবনা, শিকার, জুয়া এই সব তার বহির্ম্মুখিত্বের নানা দিক। তাকে ভালোবাসে তাদের পরিবারের আশ্রিতা একটি মেয়ে, সোনিয়া। নিকোলাস তাকে ভালোবাসে, সে ভালোবাসা তার অন্যান্য কাজের মতো ছেলেমানুষী। কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে, কিন্তু সোনিয়ার অপরাধ সে নির্ধন। তাকে বিয়ে করলে নিকোলাসদের নষ্ট সম্পত্তি ফিরবে না। তার বাবা যে জুয়ায় সব হারিয়ে বসে

রয়েছেন। নিকোলাসের মায়ের পীড়াপীড়িতে সোনিয়া তাকে তার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিল। নিকোলাস বর্ত্তে গেল, সে তো কিছুতেই তার পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করতে পারত না, অথচ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করবার মত বেইমান সে নয়। সোনিয়া এই কাব্যের উপেক্ষিতা।

ডোলোগো নিকোলাসের বন্ধু। কিন্তু দিব্যি বন্ধুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল জুয়াতে ভীষণ হারিয়ে। লোকটা অসাধারণ সাহসী, অথচ অবাধ্য। তার মনে একটা বড় দুঃখ সে গরীব। তাতে তাকে নির্দ্দয় করেছিল। তার আর একটা বৃহৎ ক্ষোভ. সে একটিও নারী দেখলে না যাকে সে শ্রদ্ধা করতে পারে, পূজা করতে পারে। তার ধারণা রাণী থেকে দাসী পর্য্যন্ত প্রত্যেক রমণীকে কেনা যায়। সে যে বেঁচে আছে তা শুধু তার মানসীকে হয়তো একদিন দেখতে পাবে এই অসম্ভব আশায়। ততদিন সে সয়তানী করবে। করবে গুণ্ডামী। তার বিধবা মা আর কুব্জা বোন আর গুটিকয়েক বন্ধু ছাড়া সবাইকে সে বেখাতির করবে।

টলস্টয়ের বর্ণনাকুশলতা এমন যে পদে পদে মনে হতে থাকে টলস্টয় স্বয়ং এসব দেখেছেন, এসব জায়গায় উপস্থিত থেকেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে, মন্ত্রণাসভায়, দরবারে, অভিজাত মহলে, ফ্রীমেসনদের আড্ডায়, গ্রামের বাড়ীতে, শিকারের পশ্চাতে, নাচের মজলিসে, চাষাদের সঙ্গে, বন্দীদের সাথে, গেরিলা দলে—সর্ব্বঘটে তিনি আছেন। কল্পনার এই পরিব্যাপ্তি, সহানুভূতির এই প্রসার

বিশ্বসাহিত্যে বিরল। অবশ্য সমাজের নিম্নতর স্তরগুলিতে তাঁর চিত্তের প্রবেশ ছিল বলে মনে হয় না। থাকলে তিনি হয়তো শেষ বয়সে তাদেরই দিকে সম্পূর্ণ হেলতেন না। তারপর এত খুঁটিনাটি ভালোবাসতেন বলে তার প্রতিক্রিয়াবশতঃ শেষের দিকে একেবারে ও জিনিষ বর্জ্জন করলেন। এক চরমপন্থা থেকে অপর চরমপন্থায় চললেন। টলস্টয়ের জীবনের তথা আর্টের ট্র্যাজেডি এই।

আলোচ্যগ্রন্থে তিনি যাকে জয়যুক্ত করেছেন সে পিটার, নাটাশাযুক্ত পিটার। কারাটাইয়েভ মরণের পূর্ব্বে তাকে যে মন্ত্র দিয়েছিল তার প্রতিধ্বনি তার কানে বাজতে থাকে। জীবনই সমস্ত। জীবনই ভগবান। সর্ব্বভূতের আছে গতি। সেই গতিই ভগবান। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ আছে ভগবানের অস্তিত্বকে জানবার আনন্দ। জীবনকে ভালোবাসলেই ভগবানকে ভালোবাসা হয়। জীবনে সবার চেয়ে কঠিন অথচ সবচেয়ে গুণের কাজ হচ্ছে জীবনের যাবতীয় অহেতুক জ্বালা সত্ত্বেও জীবনকে ভালোবাসা।*

(১৯৩৪)

* Tolstoy's War and Peace, (Everyman's Library).

বীরবল

"সবুজ পত্র" যেদিন বিনুর মতো অবুঝের হাতে প্রথম পড়ল সেদিন সেই দ্বাদশবর্ষীয় বালক আর সব বাদ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করল "চার ইয়ারী কথা।" তখন বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" চলছিল, কিন্তু বিনুর সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ যে কে ও কত বড় সে জ্ঞান ছিল না তার। গুরুত্বনির্ণয়ের, মূল্যনির্ণয়ের বয়স সেটা নয়। ভালো লাগা চিরদিনই নিরঙ্কুশ, বাল্য বয়সে সব চেয়ে বেশী। "চার ইয়ারী কথা" বিনুর ভালো লেগেছিল। ভালো লেগেছিল প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের আরো অনেক রচনা।

বীরবলেরও। বিনু তখন জানত না যে বীরবল আর কেউ নন, সেই প্রমথ চৌধুরী। সে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবত, ইতিহাসে নজির থাকলেও এমন নাম কি মানুষের হয়, আধুনিক মানুষের! বুঝত না যে ওটা একজনের ছদ্মনাম। পরে জানতে পেরেছিল উনি কে, কী ও নামের তাৎপর্য্য।

কেন এত ভালো লাগত প্রথম চৌধুরী মহাশয়ের লেখা, বীরবলের লেখা, বিনু পরে তা বিশ্লেষণ করেছিল। সে লেখায় ছিল স্বাদ। ছিল নিপুণ রাঁধুনীপনা। যত দিন বিনুর রুচি গঠিত হয়নি তত দিন সে অন্যের লেখা পড়ে তারিফ করেছে, কিন্তু একবার রুচি গঠিত হলে কেবল পাকা রাঁধুনীর রান্নাই

পচ্ছন্দ হয়, অন্যেরটা যদি হয় তবে বিষয়গুণে। বিনুর রুচি গড়ে উঠল বীরবলের রচনার আস্বাদনে, চৌধুরী মহাশয়ের লেখার স্বাদ পেয়ে।

এই বহুরূপী লেখকের যে বিষয়গুণ ছিল না তা নয়। কিন্তু বিষয়গুণকে গৌণ করেছিল তাঁর পদবিন্যাস যা দিয়ে তিনি মন হরণ করেছিলেন। এই যদি শিল্প হয় তবে এক দিন আমিও শিল্প সৃষ্টি করব, মনে মনে বলত সেই বারো বছরের বালক। বলত আর মনে মনে অনুকরণ করত বীরবলের পদবিন্যাস।

কিন্তু রচনাশিল্পের চেয়েও মুগ্ধ করত রসিক চিত্ত। জীবনের ছোট বড় কত বিষয়ে আলাপ, কিন্তু সব আলাপই রসালাপ। যুদ্ধ হোক, প্রত্নতত্ত্ব হোক, কোনো বিষয়ই গুরু গম্ভীর নয়, ছায়াচ্ছন্ন নয়। স্বচ্ছ দৃষ্টির সন্ধানী আলো কোথাও অন্ধকার রাখছে না, বিদগ্ধ মনের সকৌতুক রসনা মজলিশী ঢঙে আসর জমিয়ে তুলছে। পাঠকরা যেন এক একজন দরবারী ওমরাহ। দরবারে বসে কত জ্ঞানের কথাই শুনছেন, কিন্তু রসের অনুপান বিদ্যাকে করছে বিলাস।

চৌধুরী মহাশয় বিদ্যানগরের নাগরিক। বিদ্বান হয়েও চতুর। সে হিসাবে তিনি আধুনিক নন, তিনি ক্লাসিক। এ কালের লেখকরা হয় শিক্ষা দেন, নয় মনোরঞ্জন করেন, বিষয়-গুণে মনোরঞ্জন। কিন্তু এই উভয় বৃত্তির উপর বীরবলের বিরাগ। "সাহিত্যে খেলা" নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ আছে। সেটির থেকে তুলে দিচ্ছি তাঁর মতবাদ।

"সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া—কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশপাতাল প্রভেদ আছে, সেটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা তৈরী করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্ম্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাঙ্গলা দেশে আজ দুর্ল্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্ম্মের জয়ঢাক,—এই সব জিনিষে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।........তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া? অবশ্য নয়। কেননা কবিব মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল বন্ধ না হলে যে খেলার সময় আসে না, এ ত সকলেরি জানা কথা। কিন্তু সাহিত্য রচনা যে আত্মার লীলা এ কথা শিক্ষকেরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন।"

সাহিত্য যে আত্মার লীলা এটি ক্লাসিক ধারণা। লেখা হচ্ছে খেলা আর লেখক হচ্ছেন খেলক। কিন্তু এ দুঃসাহসিক উক্তি যে দিন দিন আরো দুঃসাহসিক হয়ে উঠছে। সমাজ আমাদের চিত্তকে এমন করে আচ্ছন্ন করেছে যে যাতে সমাজের কল্যাণ হাতে হাতে না হয়, সমাজ ভাঙাগড়ার প্রসঙ্গ না থাকে, তা সাহিত্য নামে বুর্জোয়া ইনটেলেকচুয়ালদের ঘুমপাড়ানী বলে নিন্দিত। চৌধুরী মহাশয় কিন্তু দেশের ঘুম ভাঙাতেই চেয়েছিলেন। তাঁর "সবুজ পত্রের মুখপত্র" থেকে তুলে দেখাই।

"কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা সাহিত্যের কাজও নয়, ধর্ম্মও নয়, সে হচ্ছে কার্য্যক্ষেত্রের কথা। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করাতে মনের ভিতর যে সঙ্কীর্ণতা এসে পড়ে সাহিত্যের স্ফূর্ত্তির পক্ষে তা অনুকূল নয়।....যার সমাজের সঙ্গে ষোল আনা মনের মিল আছে তার কিছু বক্তব্য নেই। মন পদার্থটি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে জেগে ওঠে এবং মনের এই জাগ্রত ভাব থেকেই সকল কাব্য, সকল দর্শন, সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এ কথা শুনে অনেকে হয় ত বলবেন যে, যে দেশে এত দিকে এত অভাব সে দেশে যে লেখা তার একটিও অভাব পূরণ করতে না পারে সে লেখা সাহিত্য নয়, সখ।... এ কথা সত্য যে মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্ ছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়।....সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা।"

সাহিত্যের খেলা তা হলে ঘুমপাড়ানী মাসীপিসীর নয়, সেই রাতজাগানী রাজকন্যার যার উপহাসে কালিদাসকে যেতে হয়েছিল বিদ্যানগরে। বীরবল তাঁর দেশবাসীকে করতে চেয়েছিলেন জাগরূক ও রসজ্ঞ। এ সম্বন্ধে তাঁর কথা বিশদভাবে বলছেন তাঁর "রূপের কথা"য়।

"শিবজ্ঞান আসে সব চাইতে আগে—কেননা মোটামুটি ও

জ্ঞান না থাকলে সমাজের সৃষ্টিই হয় না, রক্ষা হওয়া ত দূরের কথা।....তার পর আসে সত্যের জ্ঞান। এ জ্ঞান শিবজ্ঞানের চাইতে ঢের সূক্ষ্ম জ্ঞান, এবং এ জ্ঞান আংশিক ভাবে বৈষয়িক অতএব জীবনের সহায়—এবং আংশিক ভাবে তার বহির্ভূত, অতএব মনের সম্পদ। সব শেষে আসে রূপজ্ঞান, কেননা এ জ্ঞান অতি সূক্ষ্ম এবং সাংসারিক হিসাবে অকেজো। রূপজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সভ্য সমাজের গোড়ার কথা হলেও সুরুচি তার শেষ কথা। শিব সমাজের ভিত্তি, সুন্দর তার অভ্রভেদী চূড়া।.......আমার ধারণা, আমরা সব জন্মতঃ কামলোকের অধিবাসী, সুতরাং রূপলোকে যাওয়ার অর্থ আত্মার পক্ষে ওঠা, নামা নয়।”

বীরবল তাঁর দেশবাসীকে রূপলোকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সেই জন্যেই “সবুজ পত্রে”র আবির্ভাব। রূপলোকের লক্ষণ হচ্ছে নিত্য যৌবন। প্রমথ চৌধুরী যৌবনের পূজারী। যৌবন তাঁর মতে মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাই তিনি প্রাণ-উপাসক। তাঁর মন্ত্র “ওঁ প্রাণায় স্বাহা।” এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের জবানী উদ্ধৃত করছি। “যৌবনে দাও রাজটীকা”য় আছে—

“প্রাণ প্রতি মুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হয়।.......প্রাণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়ে জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, আর উন্নত হয়ে মনোজগতের অন্তর্ভুক্ত হয়। মনকে প্রাণের পরিণতি ও জড়কে প্রাণের বিকৃতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে, প্রাণের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিতে বাধা

দিলেই জড়তা প্রাপ্ত হয়।........যেমন প্রাণিজগতের রক্ষার জন্য নিত্য নূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্ম্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই।....এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য এবং কী উপায়ে তা সাধিত হতে পারে তাই হচ্ছে আলোচ্য।........সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালবাসা, নূতন কর্ত্তব্য ও নূতন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবন-প্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারেন।”

এতবার নূতনের উল্লেখ থাকলেও নূতনের প্রতি নয়, নিত্যের প্রতি তাঁর টান। সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে, এ কথা বলতে পারেন এক তিনি যাঁর মনের ছাঁদ ক্লাসিক। তাঁকে আধুনিকদের দলে ধরলেও আসলে তিনি চিরন্তনদের দলে। তাঁকে নবীন বলাও যা চির নবীন বলাও তাই। এই ছাঁদের মন কোনোরূপ আতিশয্যের আমল দেয় না। সংযমের দিকে, স্বচ্ছতার দিকে এর গতি। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, “ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ না করতে পারলে তাতে কিছুই

প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্ত্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করতে পারি তবেই তা পরে সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হবে।........সাহিত্য গড়তে কোনো বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম। লেখায় সংযত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সীমার ভিতর আবদ্ধ হওয়া।”

ক্লাসিক মনোবৃত্তির প্রধান লক্ষণ প্রসাদ গুণ। আয়াসের চিহ্ন কোথাও নেই। কিছু বাগ্‌বাহুল্য আছে, সেটা তাঁর বক্তব্যকে অস্পষ্ট করে না। বরং অতিরিক্ত স্পষ্ট করে। তা যদি দোষের হয় তবে বীরবলের একমাত্র দোষ হাতে কিছু না রেখে হাত খালি করে ছড়ানো, অর্থাৎ তিনি যা বলেন তার বেশী ব্যঞ্জিত করেন না, বলার আনন্দে বল নিঃশেষ করেন। কিন্তু এই বাহুল্যও প্রসাদগুণান্বিত। তাঁর রচনার প্রসাদগুণ তাঁর মনেরই প্রতিফলন আর তাঁর মনের পশ্চাতে রয়েছে বহু দিনের মনন ও রোমন্থন। চৌধুরী মহাশয় তাঁর মনটিকে তৈরি করেছেন সক্লেশে, তাই তাঁর বাগ্‌বিস্তার এত অক্লেশ। এবং তাঁর ভাষিতগুলির মধ্যে এতগুলি সুভাষিত। যে মনের এত পরিচ্ছন্নতা তার গঠনের ইতিহাস আমাদের সম্মুখে অনাবৃত নয়, কেননা বীরবল তাঁর প্রথম বয়সের রচনা অল্পই প্রকাশ করেছেন। হয়তো অল্পই লিখেছেন, অধিক বকেছেন। আমার অনুমান তিনি তাঁর মনের অনুশীলন করেছেন কথোপকথনে। সে সব কথোপকথনের প্রতিলিপি নেই, থাকলে দেখা যেত কী করে তাঁর মন তার বোঝা

নামাতে নামাতে লঘুভার হল, তাঁর রসনা ক্রমে শাণিত হতে হতে অসিধার হল, তাঁর কল্পনার থেকে কামনার খাদ গিয়ে বাকী রইল রূপের স্বর্ণাভা। কী করে তিনি যৌবনের অন্তে দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ করলেন, একটুখানি আভাস আছে "কৈফিয়ৎ" নামক একটি কবিতায়।

রসনার প্রসাধন যে বীরবলের সাহিত্য সাধনার অন্তরালে, আমার এই অনুমান যদি সত্য হয় তবে এক ঢিলে দুই পাখী মরে। প্রথমতঃ তিনি যে কথ্যভাষার ভগীরথ এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু থাকে না। কথক হতে হতে যারা লেখক হয় তারা লেখার কৃত্রিমতা মানতে নারাজ, তাই লেখ্য ভাষাকে মঞ্চচ্যুত করে। কথ্য ভাষার বিপক্ষ দল যদি তর্ক না করে গল্প করতে জানতেন, সোরগোল না করে আলাপ করতে জানতেন তা হলে একা বীরবল ও তাঁর জনকয়েক শিষ্য মিলে এত কম সময়ে কথ্যভাষাকে আমাদের আসরের ভাষায় পরিণত করতে পারতেন না। লেখ্য ভাষা অবশ্য সরকারী ভাষা, সেটুকু সান্ত্বনা তার থাক।

দ্বিতীয়তঃ তিনি ছোট গল্পের মুক্তিদাতা। তাঁর হাতে প্রবন্ধও ছোট গল্প, বিবরণ বা সমাচারও তাই। জীবনের যে কোনো ঘটনা বা ঘটলে ঘটতে পারত এমন যে কোনো অঘটনা তাঁর কাহিনীর কথাবস্তু। প্লটের জন্যে তাঁর আটকায় না, প্লট না জুটলেও গল্পের উপাদান জোটে। মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হলেই মুখে মুখে গল্প পল্লবিত হয়, সত্য মিথ্যা খেয়াল কল্পনা একাকার হয়ে যায়। গল্প তো আমাদের চারদিকে

হাওয়ার মতো ঘুরছে, তাকে বন্দী করার ফন্দী জানলে একাধিক সহস্র রজনী ভোর হয়। বীরবলের গল্পগুলি শ্রুতিসুখকর, তাদের আবেদন শ্রুতির কাছে। সে হিসাবে সেগুলি খাঁটি গল্প, যাকে ইংরাজীতে বলে yarn. তিনি সূতো কাটতে ওস্তাদ। যেমন মিহি তাঁর সূতো, তেমনি মোলায়েম। যেন মসলিনের সূতো।

"চার ইয়ারী"র উল্লেখ করে সুরু করেছি, সমাপনও করি। "চার ইয়ারী" থাকবে। শুধু রচনার স্বাদের জন্যে নয়, সৃষ্টির আর্টের জন্যে নয়, চিত্তের রসের জন্যে নয়, যদিও এর প্রত্যেকটি আপনাতে আপনি মূল্যবান। মন দিয়ে অধ্যয়ন করলে অনুভব করা যায় একটি বিদগ্ধ জীবন রয়েছে ওর পশ্চাতে। ওর অনেকখানি হয়তো কাল্পনিক বা পড়ে পাওয়া। কিন্তু ওর যেটুকু শাঁস সেটুকু একটি রক্তিম হৃদয়ের পদ্মরাগ মণি, যেমন উজ্জ্বল তেমনি করুণ। ইচ্ছা করলেই আর একখানা "চার ইয়ারী" লেখা যায় না, কেননা ইচ্ছা করলেই আর একবার তরুণ হওয়া যায় না, আর একবার তরুণের চোখে তরুণীকে দেখা যায় না, আর একবার fool হওয়া যায় না। দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ করে প্রথম যৌবনের swan song গাওয়া হয়েছে ওতে।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন

চার বছর আগে কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল আত্রাই নদীর বোটে। পতিসর থেকে ফিরে তিনি ট্রেনের অপেক্ষা করছিলেন। তার পরে আমরা প্ল্যাটফর্মে এলুম ও এক কামরায় উঠলুম। রবীন্দ্রনাথকে এত নির্জনে কোনো বার পাইনি। তখনি লক্ষ্য করেছিলুম তাঁর আননে অন্য এক সৌন্দর্য্য। সে সৌন্দর্য্য গত বছর শান্তিনিকেতনে আবার লক্ষ্য করেছি। সর্ব্বপ্রকার পার্থিব কামনার ঊর্দ্ধে উঠলে সংসার সম্বন্ধে সত্য সত্যই নির্লিপ্ত হলে শিল্পীপ্রকৃতির মানুষের জীবনে যে সৌন্দর্য্য বিকশিত হয় তার সঙ্গে যদি যোগ দেয় পরিণত বয়সের "all passion spent" ক্ষান্তবর্ষণ শারদাকাশ তবে সেই শারদ সৌন্দর্য্য বিভাসিত হয় শুক্ল কেশের কাশগুচ্ছের পটভূমিকায় প্রশান্ত উদাস ললাটে। রবীন্দ্রনাথকে এর আগে এত ভালো লাগেনি, এত সুন্দর মনে হয়নি। এই পরিচয় দিয়ে যাবার জন্যে তাঁর এত কাল জীবিত থাকার প্রয়োজন ছিল। জীবন যদি হয় পরিচয়জ্ঞাপন তবে আরো দীর্ঘ জীবনেরও প্রয়োজন আছে। বোধ হয় এইজন্যেই ঋষিরা বলে গেছেন, পশ্যেম শরদং শতং জীবেম শরদং শতং।

মৃত্যুর সমীপবর্ত্তী হয়ে তাঁর মৃত্যুভয় ক্ষয় হয়েছে। মনে

হয় তিনি সাগরসঙ্গমের অস্ফুট কল্লোল শুনতে পেয়েছেন। তাঁর ইদানীন্তন কবিতায় এই বিচিত্র উপলব্ধির বার্ত্তা আছে। শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও এটা একপ্রকার উপভোগ। নিরাসক্ত নিঃশঙ্ক নির্মল হয়ে জীবনকে তিনি চূড়ান্ত উপভোগ করছেন। ব্রাউনিং যে বলেছিলেন—

"Grow old along with me
The best is yet to be"—

তা এই উপভোগের আশায়। এ উপভোগ তখনি আসে যখন মানুষ যাবার জন্যে তৈরি হয়ে যানের অপেক্ষায় বসে। যা কিছু সঙ্গে নেবার তাও গোছানো হয়েছে, যা কিছু রেখে যাবার তাও গোছানো। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, বাইরে কিম্বা ভিতরে, পিছনে কিম্বা সঙ্গে। কিছু এলোমেলো পড়ে থাকার ক্ষোভ নেই, কিছু অসমাপ্ত রইল বলে খেদ নেই। তাই দু'দিন থেকে যাবার আগ্রহ নেই। তবে তিনি উতলাও নন। মানুষকে তিনি ভালোবাসেন, মানুষ তাঁকে ভালোবাসে। এই সম্পর্ক হঠাৎ ছিন্ন করবেন কী করে!

উতলা নন। অথচ তাঁর সঙ্গে কথা কইলে বোঝা যায়, যদিও তাঁর ব্যক্তিগত কোনো বাসনা নেই, তবু মানুষের কাছে তাঁর যে বিরাট প্রত্যাশা ছিল সে প্রত্যাশার ক্রমিক অন্তর্ধান তাঁকে বিহ্বল করে তুলেছে। মানবজাতির অধঃপতন যে কত নিম্নে পৌঁছেছে তা মর্মে মর্মে অনুভব করে তিনি

বেঁচে আছেন বলে গ্লানি বোধ করেছেন। যে জার্মানীতে তিনি রাজসমারোহে অভিনন্দিত হয়েছিলেন সেই তাঁর অতি প্রিয় জার্মানী আজ কোথায়! কোথায় তাঁর আরো প্রিয় জাপান! আর ইংলণ্ড? যে ইংলণ্ড তাঁর অবাল্য শ্রদ্ধাভাজন যার শ্রদ্ধা তিনি প্রৌঢ় বয়সে লাভ করে বিশ্ববিখ্যাত হন, সেই ইংলণ্ড! তাঁকে যাবার আগে এও দেখতে হলো—এই পতন ও ধ্বংসের চিত্র! আর তাঁর দুর্ভাগা দেশ? দেশের জন্যে তাঁর যে আক্ষেপ তা বিলাপের তুল্য, কখনো কখনো প্রলাপের সদৃশ। গৌরব করবার কিছু নেই, আশা করবার কিছু নেই, শুধু দিনযাপনের গ্লানি, শুধু প্রাণধারণের পীড়া। তথাপি তাঁর আস্থা আছে ভারতের উপর, গান্ধীজীর উপর। দেশবিদেশের নবজাতকদের প্রতি, নবীনদের প্রতি তাঁর আশীর্বাদ রয়েছে সব সময়। বিশ্বের অফুরন্ত যৌবনে তাঁর অফুরন্ত বিশ্বাস। তিনি আজকাল ভগবানে বিশ্বাস করেন কি না প্রশ্ন করে ধরাছোঁয়া পাইনি, কিন্তু প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তারুণ্যে ও মানবের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে তিনি চির দিনের মতো এখনো বিশ্বাসবান।

তাঁর জীবনের অস্তাচল যদিও মেঘাচ্ছন্ন তবু তিনি একমনে রশ্মি বিকীরণ করে চলেছেন। গ্যেটে ও টলস্টয়ের শেষজীবনের মতো তাঁর শেষজীবনও বিচিত্র প্রয়াসে পূর্ণ। তিনি যে এই বয়সেও প্রচুর লিখে আমাদের প্রত্যহ লজ্জা দিচ্ছেন তা আমরা কনিষ্ঠেরা স্বীকার করি। কিন্তু সেই তাঁর একমাত্র কাজ নয়।

আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি ছবি আঁকি কি না। আঁকিনে শুনে ক্ষুণ্ণ হলেন, যেন ওর মতো আনন্দ আর নেই। যেন চেষ্টা করলে সকলে পারে। এবার তাঁর ছবি আঁকতে বসা চাক্ষুষ করে এলুম। বললেন, তুলি দিয়ে তিনি যেমন আত্মপ্রকাশ করতে পারেন তেমন লেখনী দিয়ে নয়। দুয়োরাণীর চেয়ে সুয়োরাণীর দিকেই তাঁর শেষ বয়সের টান। সম্পাদকেরা তাঁকে লিখতে বাধ্য করেন, নইলে তিনি বোধহয় লিখতেন না, আঁকতেন। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, তবু তুলির আঁচড় জোরালো ও ধারালো। সিংহের মতো থাবা ও নখর দিয়ে তিনি যা আঁকছেন তা এক হিসাবে লেখার চেয়ে দামী। তাতে তাঁর এই বয়সের আসল চেহারা ফুটছে। লেখেন তিনি অভ্যাসবশে। তেমন জিনিষ গতানুগতিক না হয়ে যায় না। কিন্তু আঁকার বেলায় অন্য কথা। আমার মনে হয় তাঁর প্রকৃত পরিচয় এক এক বয়সে এক একটি মিডিয়ম খুঁজেছে। এখনো তিনি গান রচেন, কিন্তু গানে আর তাঁকে তেমন করে পাওয়া যায় না যেমন ছবিতে। পনেরো বছর আগে গানেই তাঁকে পাওয়া যেত, গদ্যে নয়। কবিতা অবশ্য তাঁর জীবনসঙ্গিনী। কিন্তু তাঁর কবিতাও ক্রমে তাঁর ছবির মতো খাপছাড়া হয়ে উঠেছে। আমাকে বলছিলেন ছড়া লিখতে। বাংলা কবিতার নিজের রূপটি নাকি ছড়াতেই খোলে। ছড়ার কথা তিনি আমাকে এমন করে বোঝালেন যে আমি অতি সহজেই দীক্ষিত হলুম। তবে এখনো ছড়া লিখিনি। তিনি যেসব ছড়া লিখেছেন সেসব তাঁর ছবিরই আরেক সংস্করণ। মনে হয় বিশুদ্ধ

রেখার মতো বিশুদ্ধ শব্দের ভিতরে যে রস আছে সেই রস তিনি আস্বাদন করছেন। অর্থের জন্যে তাঁর ভাবনা নেই। ছোট ছেলেরা যেমন হিজিবিজি ও আবোলতাবোলের রসে মুগ্ধ কবিও তাঁর দ্বিতীয় শৈশবে সেই রসের রসিক। তবে এগুলি অর্থহীনও নয়, অর্ব্বাচীনও নয়। তাঁর ছবিতে যে জিনিষ সব চেয়ে চোখে ঠেকে সে তাঁর জোর, যে জোর ছিল প্রাগৈতিহাসিক মানবের। তাঁর ছড়ায় যে জিনিষ কানে বাজে সে তাঁর বিস্ময়, যে বিস্ময়ের সহিত আদি মানব আবিষ্কার করেছিল শব্দের সঙ্গে শব্দ যোজনা করে শব্দধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের ছবি ও ছড়া অবচেতন মনের প্রকাশ। যেন তাঁর মনের নীচের তলায় লক্ষ বছর আগের মন বাস করছে, তাকেই তিনি উপরে উঠে আসতে দিচ্ছেন।

কখনো ছবি আঁকছেন, কখনো ছড়া কাটছেন, কখনো গানে সুর দিচ্ছেন, কখনো নাচের মহড়া দেখছেন। শুনতে পাই গোপনে গোপনে রান্নার পরীক্ষাও চলে, আর হোমিওপ্যাথিক না বাইওকেমিক চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই কর্মিষ্ঠতা তাঁর সারা জীবনের অভ্যাস। শিলাইদহে শুনেছিলুম তিনি নাকি একবার মাটিতে মাছ পুঁতে নতুন রকমের সার তৈরি করতে চেয়েছিলেন, পচা মাছের গন্ধে গাঁয়ের লোকের টেকা দায় হয়েছিল। চাষ করবেন তাঁর ছেলে, সেজন্যে তিনি তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়ে ক্ষান্ত হননি, একটা আস্ত চর কিনেছিলেন বা কিনতে যাচ্ছিলেন কৃষির জন্যে। শিলাইদহের কাছারিতে তাঁর হাতের খানকয় জমিদারি চিঠি পড়েছিলুম। সেসব চিঠিতে তাঁর

যে পরিচয় তা একজন ঝুনো জমিদারের। তাতে সাহিত্যের স্বাদ ছিল না, তবে রচনার সৌষ্ঠব ছিল বটে। পতিসরে তাঁর জমিদারি চালনার নমুনা দেখেছি, আর দেখেছি তাঁর প্রজা-হিতৈষণার চিহ্ন। প্রজারা যে তাঁকে ভালোবাসত ও ভুলতে পারেনি তা আমি প্রজাদের মুখেই শুনেছি। একবার এক বৃদ্ধের মুখে তাঁর যৌবনের যেসব কাহিনী শুনেছিলুম তার একটি মনে আছে। তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের সময় প্রজারা তাঁকে যেসব উপঢৌকন দিয়েছিল প্রথম দিন তিনি সেসব নিয়েছিলেন, কেননা ওটা একটা প্রথা। কিন্তু পরদিন তিনি সেগুলি ফিরিয়ে দিলেন। "কী লজ্জা! আমার পিতার শ্রাদ্ধ! আমি নেব তোদের উপহার!" এই বলে তিনি তাদের অবাক করে দিলেন! বোধ হয় এমন অপূর্ব্ব উক্তি ভূভারতের কোনো জমিদারের মুখে শোনা যায়নি। প্রজারা যে তাঁকে ভক্তি করবে এটা স্বাভাবিক। সেবার আত্রাইতে কবি বলছিলেন, "প্রজারা আমাকে দেখতে এসে বলল, পয়গম্বরকে আমরা চোখে দেখিনি। আপনাকে দেখে যাই।"

কিন্তু কর্মিষ্ঠতা যদিও রবীন্দ্রনাথকে গ্যেটে ও টলস্টয়ের সঙ্গে তুলনীয় করেছে তবু তাঁদের সঙ্গে তাঁর মূলতঃ পার্থক্য আছে। কর্মের ভিতর দিয়ে তাঁদের যে চলা তা স্রোতের গতি, তার যতি নেই। আর রবীন্দ্রনাথের চলা পাখীর ওড়া। আকাশে ওড়ে, নীড়েও ফেরে।

"যেন আমার গানের শেষে
থামতে পারি সমে এসে"—

একথা ইউরোপের নয়, ভারতের। রবীন্দ্রনাথের সাধনা এই সমে আসার সাধনা। তাঁর অন্তরের অন্তরালে একটি পরম আশ্রয় আছে, সেটি তাঁর নীড়। সেখানে তিনি তাঁর জীবনের পর্ব্বে পর্ব্বে ফিরেছেন, সেইখান থেকে যাত্রা করেছেন। তিনি পদে পদে মিলিয়ে নিয়েছেন আকাশের সঙ্গে নীড়কে, নীড়ের সঙ্গে আকাশকে। তাই তাঁর আদির সঙ্গে অবসানের, উদয়ের সঙ্গে অস্তের একটি গভীর সঙ্গতি পাবে ভাবী কাল। এমন সঙ্গতি, এমন ঐক্য অন্য কারো জীবনে পাবে না এ যুগের।

একদিক থেকে এটা একটা বাধাও বটে। পাখীকে বেশী দূরে উড়তে দেয় না তার নীড়। সে প্রতি রাত্রে ফিরে আসে তার কেন্দ্রে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রাচুর্য্য আছে, বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু তাঁর পক্ষের বিস্তার সীমাহীন নয়, তাঁর জীবনের বাণী নিত্য বলেই তা পুনরুক্তিপরায়ণ। এই ত্রুটি তাঁর একার নয়। এটা তাঁর দেশেরও। আমাদের পক্ষের বিস্তার নেই—কি কায়িক, কি মানসিক। আছে কেবল বাচিক। আমরা ছুটে গেলে ছুটে আসি, উধাও হতে পারিনে। পক্ষান্তরে অমন একরোখা গতি সদ্‌গতি নয়। ওতে শান্তি নেই। গ্যেটের বা টলস্টয়ের শেষজীবন শান্তির ছিল না। দ্বিধায় সংশয়ে পতনে উত্থানে ব্যাকুলতায় জটিলতায় আবর্ত্তিত ছিল। সেই নিগূঢ় অন্তর্ব্বিরোধ রবীন্দ্রনাথের জীবনে থাকলে তা অত্যন্ত সুশাসিত। তিনি তাঁর পিতার কাছে যে শিক্ষা পেয়েছেন, যে শিক্ষা পেয়েছেন প্রকৃতির কাছে তার ফলে তাঁর মনে বাইরের

বিরোধের ছায়া পড়লেও তাঁর অন্তর নির্দ্বন্দ্ব। সম্প্রতি জগতের অন্যায় ও অনাচার তাঁর মনের উপর আঘাত করছে। কিন্তু ভিতরে শান্তির নীড়।

রবীন্দ্রনাথের ভিতরের বাঁধুনি তাঁকে আজীবন রক্ষা করেছে, জীবনের কোনো অবস্থায় ভ্রষ্ট হতে দেয় নি। সে বাঁধুনি এতই কঠোর যে এই আশী বছর বয়সেও তাঁর কথাবার্ত্তা একটুও বেফাঁস নয়, তাঁর উক্তি অসম্বদ্ধ নয়। তিনি যা বলেন গুছিয়ে বলেন, রসিয়ে বলেন। অনুপ্রাস ও উপমা এই বয়সেও আছে। হাস্য পরিহাস এখনো তাঁর স্বভাব। শরীর অবশ্য জীর্ণ হয়েছে, কিন্তু মনের কোথাও জরার লক্ষণ নেই। স্মৃতি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে, তাই ভুল হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু বুদ্ধি তেমনি মার্জিত, কল্পনা তেমনি রঙীন, ভদ্রতা তেমনি অবারিত, স্নেহ তেমনি অকুণ্ঠিত। তাঁর মাজা দুর্ব্বল হয়েছে, নুয়ে নুয়ে হাঁটেন, দেখলে কষ্ট হয়। কিন্তু মজ্জা তেমনি সবল। বুদ্ধির উপর কালের কুয়াশা নামেনি, প্রজ্ঞার দীপ্তি অম্লান। তাঁর ভিতরের বাঁধুনি তাঁকে শেষ বয়সের চরম লজ্জা থেকে রক্ষা করেছে— ভীমরতি থেকে।

রবীন্দ্রনাথ কাজের লোক। উপনিষদে লিখেছে, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।" কাজ করতে করতে তিনি আশী বছর অতিক্রম করতে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি কেবল কাজের লোক নন, তিনি ছুটির মানুষ। সে ছুটি তিনি কাজের মাঝখানেই ভোগ করেন। যখনি তাঁর কাছে গেচি তখনি তিনি

এমন ভাবে অভ্যর্থনা করেছেন যেন তাঁর হাতে দেদার ছুটি, এমন ভাবে কথা কয়েছেন যেন তাঁর সময় কাটছে না। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! কয়েক মিনিট পরে আর কেউ গিয়ে হাজির। আসলে তাঁর সময় সিকি পওসাও নেই, তিনি নিরন্তর ব্যাপৃত। অথচ তিনি তাঁর চার দিকে একটি ছুটির আবহাওয়া সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাঁর ব্যস্ততা বা ত্বরা নেই। কোথায় যে তাঁর ছুটির উৎস আমি তার সন্ধান পাই নি। বোধ হয় মন মুক্ত হলে কাজ মানুষকে বাঁধে না। মানুষ খাটে, কিন্তু সে খাটুনি খেলার মতো লাগে। রবীন্দ্রনাথ মুক্ত পুরুষ। আধ্যাত্মিক অর্থে না হোক. সাংসারিক অর্থে। তাঁর কোনো বাঁধন নেই, তাই তাঁর ভিতরে ছুটির ফুর্তি।

অন্যের বেলায় দেখি বয়স যত বাড়ছে রক্ষণশীলতাও তত প্রবল হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কিনা মুক্ত পুরুষ, তাই তিনি সংস্কারমুক্ত। শুনেছিলুম তাঁর সঙ্গে যে কোনো বিষয়ে আলাপ জমানো যায়, এমন কি promiscuity সম্বন্ধেও। তাঁর গত বছর প্রকাশিত "ল্যাবরেটরি" গল্পটি পড়ে প্রমাণ পেলুম। কোনো আধুনিক লেখক তাঁর চেয়ে আরো অধুনিক নন, তাঁর দুঃসাহস আমাদের অনেকেরই পক্ষে অসম সাহস। অথচ এমনি সংযত তাঁর শিল্পিত্ব যে মনে কোনো বিকার জাগে না! রবীন্দ্রনাথের মনের বাঁধুনি তাঁকে বর্মের মতো রক্ষা করেছে এখানেও। রবীন্দ্রনাথ চির দিন এতটা সংস্কারমুক্ত ছিলেন না, তাঁর সতীত্বের সংস্কার একদা অতি দৃঢ়মূল ছিল। মনের মুক্তির

সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারের বাঁধন আলগা হয়েছে। তা বলে তিনি তাঁর বর্ম ও কবচ ত্যাগ করেননি। বরং তাঁর মনের বাঁধুনি শক্ত আছে বলেই তাঁর মন ক্রমে ক্রমে মুক্ত হতে পেরেছে। দেহের বাঁধুনি শক্ত না হলে যেমন আয়ুর ভার বহন করা যায় না মনের বাঁধুনি শক্ত না হলে তেমনি মনের বাঁধন খোলে না। তিনি যে গদ্য কবিতা লেখেন সেক্ষেত্রেও সেই একই কথা। তাঁর ছন্দের সাধনা নিখুঁৎ বলেই তিনি ছন্দের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করতে পারেন, তাঁর মিলের হাত সাফাই আছে বলেই তিনি মিলকে সাফ অস্বীকার করতে পারেন। তিনি যে মুক্তক লেখেন তার পিছনে রয়েছে পদ্যের পদ্মাবতীর চরণচারণচক্রবর্ত্তীপনা। জীবনব্যাপী পদসেবার পর তিনি একটু ঢিলে দিচ্ছেন। সে অধিকার তাঁরই আছে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন তাঁর জীবনশতদলের মুক্তির ইতিহাস। এক একটি করে দল খুলেছে, সেই সঙ্গে বন্ধন খুলেছে। সমাপ্তির তটে বসে তিনি প্রতীক্ষা করছেন চরম মুক্তির শেষ খেয়ার।

(১৯৪১)

চোখের দেখা

চোখের দেখার মূল্য কী? যত লোক তাজমহল দেখতে যায় তাদের সকলে কি তাজমহলের সত্যকার রূপ দেখতে পায়? তেমনি রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীজীর বেলায়।

তবু ইচ্ছা করে চোখে দেখতে, কথা শুনতে, কথা কইতে, পরিচয় দিতে ও নিতে। এবং তার পরে সেসব লিপিবদ্ধ করতে। তাতে মহামানবদের প্রতি অবিচার হওয়া সম্ভব সেই আশঙ্কায় এত দিন ইতস্ততঃ করেছি। কিন্তু যদি কোনো দিন না লিখি তবে একজনের সাক্ষ্য একেবারেই গোপন থাকে।

এই প্রবন্ধে আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলব যে রবীন্দ্রনাথ, রমাঁ রলাঁ, বারট্রাণ্ড রাসেল, বার্নার্ড শ, এইচ জি ওয়েলস ও মহাত্মা গান্ধীকে আমি চোখে দেখেছি, তাঁদের কারো কারো সঙ্গে কথা কয়েছি, তাঁদের একজনের সঙ্গে চা খেয়েছিও। তবে হলফ করে বলতে পারব না যে রলাঁ আমাকে যা দিয়েছিলেন তা চা না কফি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় না হওয়ার এই এক বিপদ যে এসব খুঁটিনাটি আমার স্মরণ থাকে না।

রবীন্দ্রনাথকে দেখতে যেবার শান্তিনিকেতন প্রথম যাই সেবার আমার সঙ্গে অন্য কেউ ছিল না, আর আমিও তখন নামপরিচয়হীন ছাত্র। সেটা বোধ হয় ১৯২৪-এর বসন্ত

কাল। কবির ঘরে সেকালে পাহারা থাকত না, ঘরটিও ছিল খোলা জায়গায়। সটান হাজির হয়ে দেখলুম কবি কী লিখছেন। আমার দিকে দৃষ্টি পড়লে বললুম, "আপনার কাছে একটি জিজ্ঞাসা ছিল, আপনার কি সময় হবে?" কবি বললেন, "কী জিজ্ঞাসা?" জিজ্ঞাসাটা অবশ্য ছল। আলাপটাই লক্ষ্য। আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম এমন সময় কবির কয়েক জন আত্মীয় এসে উপস্থিত হলেন, বোধ হয় গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। কবি বললেন, "কাল এসো।" পর দিন কবি একখানা ইংরাজী মাসিকের উপর চোখ রেখে চুপ করে বসেছিলেন, আমাকে লক্ষ্য করে কি না করে বারান্দায় এলেন একটি গানের সুর গুন গুন করতে করতে। আমি ঠিক কী ভাবে আরম্ভ করব ভাবছি এমন সময় আগমন করলেন তাঁর কন্যা। আমি যে একা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করতে গেছি এই আমার তখনকার দিনের সেরা য়্যাডভেঞ্চার। নারীজাতির সম্মুখীন হতে সাহস ছিল না। আমি প্রস্থান করলুম বিনা বাক্যে। কিন্তু পরাজিত হয়ে পাটনা ফিরলে বন্ধুরা কী বলবে! আরো এক রাত খরচ করে গেস্ট্ হাউসে থাকলুম। পর দিন ভোর বেলা কবি রাস্তার উপর পায়চারি করছিলেন। আমি পিছু নিলুম। এমন সময় য়্যাণ্ড্রুজ সাহেবের আবির্ভাব। আমি হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু য়্যাণ্ড্রুজ সাহেবের দয়াব শরীর, তা ছাড়া কবির সঙ্গে পায়চারি করা কতক্ষণ চলে! য়্যাণ্ড্রুজ

জোর কদমে পা চালিয়ে দিলেন। আমিও আর কালবিলম্ব না করে ধাঁ করে প্রশ্ন করলুম, "ইয়ে—কী বলে—Is Art too good to be human nature's daily food ?" সেই পাটনা থেকে মুখস্থ করে এসেছি। নইলে মুখে আটকে যেত নিশ্চয়।

কবি বললেন, "আচ্ছা, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায়।" তাঁর সঙ্গে আরো দু'একটি কথা হয়েছিল। মনে আছে Higher Mathematics সকলে বুঝতে পারে না বলে তাতে জল মিশিয়ে সরল করা সম্ভব নয়। যার ইচ্ছে সে নিম্নতর গণিত অধ্যয়ন করে উচ্চতর গণিতের যোগ্য হোক। উচ্চতর গণিতের সঙ্গে আর্টের তুলনায় তখনকার দিনে আমি অপ্রসন্ন ছিলুম, তর্ক করতে পারতুম। এমন সময়—যাক, ফিরে গিয়ে বলতে পারব যে কবির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। অন্তত কবিকে আমি নিজের চোখে দেখেছি।

তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় যাইনি। কাগজে দেখেছিলুম তিনি কথা রেখেছিলেন। "একটি বিদেশী ছাত্রে"র প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন।

এর পরে কতবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু প্রথম বারের মতো য়্যাডভেঞ্চার আর হয়নি। অভিভূত হয়েছিলুম তাঁকে দর্শন করে। তাঁর কবিত্ব কেবল কাগজে নয়, জীবনেও। চেহারায়, চাউনিতে, ভঙ্গীতে, কণ্ঠস্বরে, কথায়—কোথাও কবিত্বের অনুপস্থিতি নেই। কোনো সময়েই তিনি কবিছাড়া অন্য কিছু

নন। কাব্য ও জীবন এক হয়ে গেছে গঙ্গাযমুনার মতো, তাঁর কাব্যই তাঁর জীবন, জীবনই কাব্য। আমরা যারা কবিতা লিখি, আমরা কি সব সময়েই কবি? সব বিষয়েই? এই জিজ্ঞাসা নিয়ে স্বস্থানে ফিরেছিলুম।

এর এক বছর কি দেড় বছর পরে একদিন অমি গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে—ধারকরা ক্যামেরা, ছবি তুলতে জানিনে—জর্নালিষ্ট সেজে প্রবেশ করি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায়। ও ছড়া প্রবেশের দ্বিতীয় উপায় ছিল না। পাটনার সেই অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ। হলটির এক ধারে বুদ্ধ মূর্ত্তির মতো বসেছিলেন গান্ধীজী। তাঁর সামনে একটি ছোট ডেস্ক। দিনটা বোধ হয় গরম ছিল, নেতারা বার বার উঠে যাচ্ছিলেন বাইরে গল্প গুজব করতে, কিন্তু মহাত্মাজী অবিচল। কী অসাধারণ ধৈর্য্য, একাগ্রতা, কর্ত্তব্যবোধ! ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক ভাবে বসে শুনছিলেন, বলছিলেন, লিখছিলেন। আনাগোনা করছিলেন সার আলি ইমামের মতো কত প্রসিদ্ধ লোক, সকলেই ঘুর ঘুর করছিলেন একজনকে ঘিরে, কখনো তাঁর কাছে, কখনো তাঁর থেকে দূরে। নেতাদের ছুটি আছে, ছুটাছুটি আছে, কিন্তু মহানায়কের নেই।

গত বছর মালিকান্দায় গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছলুম। এবার একটি ডেস্কের একদিকে তিনি, অন্যদিকে আমি। একেবারে সামনাসামনি। ব্যক্তিগত বিষয়ে অল্প কয়েকটি কথা। তিনি শুধু শুনলেন ও মাথা নেড়ে বললেন, "হুঁ।" চাপা

লোক, সহজে ধরাছোঁয়া দেন না। আমার শোকের সমাচার শুনে বিষণ্ণ হলেন। বললেন, "এসব কি মানুষের হাতে ?" তাঁর স্বর আর্দ্র ও নয়ন স্নিগ্ধ। অন্য এক প্রসঙ্গে একটু হাসলেন। হাসলে তাঁর চেহারা বদলে যায়। চোখের মণি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শিশুর মতো সরল তাঁর হাসি। কিন্তু সেও ক্বচিৎ। অধিকাংশ সময় তিনি গম্ভীর, মৌন, স্থির।

খালি গায়ে থাকেন। কিন্তু বিসদৃশ বোধ হয় না। মনে হয় ওই তো স্বাভাবিক। কিন্তু যা স্বাভাবিক তা সহজ নয়। এতগুলি কংগ্রেসনেতার মধ্যে একমাত্র গান্ধীজীর এই বেশ। তাঁরও চিরদিন ছিল না। তাঁর সাহেবিয়ানা তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় দিয়ে এলেন, গুজরাটিয়ানা দিলেন ১৯২১এর শেষভাগে মাদুরায়। তিনি বড় আশা করেছিলেন যে দেশের লোক তাঁর নির্দেশমতো খাদি তৈরি করবে ও পরবে। যখন দেখলেন যে বছর শেষ হতে চলল, দেশের সাড়া অতি সামান্য, তখন তিনি ঘোষণা করলেন যে, "as a sign of mourning, he would discard for a month his dhoti, vest and cap, and content himself with a mere loin-cloth, and when needed, an additional piece of cloth to be thrown over the upper part of the body." সেই এক মাসের পর কত এক মাস অতীত হয়েছে, তাঁর সেই শোক দূর হয়নি, এখনো তাঁর অঙ্গে সেই অশৌচের চিহ্ন। ইংলণ্ডের শীতেও তিনি সেই পরিধেয় পরিবর্তন করেননি।

গান্ধীজীকে দেখলে বুঝতে দেরি হয় না যে তাঁর শক্তির বাজে খরচ নেই। অপরের যেমন ধনের রিজার্ভ, রসদের রিজার্ভ, সৈন্যবলের রিজার্ভ, গান্ধীজীর তেমনি আত্মশক্তির রিজার্ভ। তিনি তাঁর সারা জীবন ধরে প্রস্তুত হচ্ছেন, জীবনের ধনুকে ছিলে চড়াতে চড়াতে তাকে শরযোজনার যোগ্য করছেন। হয় লক্ষ্যভেদ করবেন, নয় ভেঙে খান খান হবেন। মধ্য গতি নেই। তাঁকে বৈরাগী বলে ভ্রম হয়, কিন্তু তিনি অস্ত্রসাধক। বৈরাগ্য তাঁর অস্ত্রসাধনার আনুষঙ্গিক।

রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছি। যাঁরা "পথে প্রবাসে" পড়েননি তাঁদের জন্যে একাংশ উদ্ধৃত করলুম।

"জাঁ ক্রিস্তফের স্রষ্টাকে তাঁর ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে মনে মনে যে কল্পমূর্তিটি গড়েছিলুম, সেই মুর্ত্তিটিকে ভেঙে ফেলতে হলো বলে দুঃখ হলো, কিন্তু মানুষটিকে ভালোবাসতে বাধল না। বলিষ্ঠমনা পুরুষের বাহিরটা বলিষ্ঠদেহ পুরুষের মতো হয়ে থাকলে শ্রদ্ধা বাড়ত, কিন্তু ঐশ্বর্য্যময় মনের বাহিরটা শিশু ভোলানাথের মতো দেখে মমতা জন্মাল। দেহে মনে সুসমঞ্জস পার্সন্যালিটি বলতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি। গান্ধীকে দেখে নিরাশ হয়েছিলুম, রলাঁকে দেখে হলুম। এঁদের দেহ এঁদের মনের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ও আগুনকে ঢেকেছে, সন্ন্যাসীর গায়ের বিভূতি যেমন তার অন্তরের তপস্যাকে ঢাকে। কিন্তু যেমন গান্ধীর প্রতি তেমনি রলাঁর প্রতি এমন

একটি মমতা জাগল যেমনটি নিছক গুণী ব্যক্তির প্রতি জাগে না।”

রলাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সুইটজারলণ্ডে ১৯২৮এর গোড়ায় কিম্বা ১৯২৭এর শেষে। আর একটি অংশ উদ্ধার করি।

“এতক্ষণ সহজ ভাবে কথা বলছিলেন আপনার লোকের মতো ঘরোয়া ভাবে মৃদু মিষ্ট হেসে। যেই ভাবী যুদ্ধের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ উঠল অমনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রাজা লীয়ারের মতো। নির্ব্বাণোন্মুখ শিখার মতো স্তিমিত নেত্রে আবেগ জ্বলে উঠল। দক্ষিণ হস্ত আবেগে উঠতে পড়তে লাগল বেগময়ী ভাষার সঙ্গে তাল রেখে। তন্ময় হয়ে চেয়ার থেকে সরে সরে এসে খসে পড়েন বুঝিবা। গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে তাঁর হৃদরের এক স্থলে একটি ক্ষত আছে, সেই ক্ষতটিতে আঙুল ছোঁয়ালে যাতনায় অধীর হয়ে ওঠেন।”

সেই রলাঁ এখন আর শান্তিবাদী নন, এবারকার যুদ্ধে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসিধারণের অনুকূল। বারট্রাণ্ড রাসেলও তাই। এঁদের দু'জনের শান্তিবাদ কেন যে এক মহাযুদ্ধের প্রহার সইল, অন্য মহাযুদ্ধে ভেঙে পড়ল, তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

রাসেলকে দেখি ১৯২৮এর শরৎকালে, লণ্ডনের এক সভায়। তাঁর বক্তৃতার বিষয়টি মনে নেই, কথাগুলির একটিও মনে নেই। রাসেলের লেখা যেমন রসাল বক্তৃতা তেমনি নীরস। হয়তো

ছাপার হরফে সেই জিনিষই সরস লাগত, কিন্তু সেদিন কান দিয়ে যেটুকু শুনেছি সেটুকু উপভোগ করিনি। তিনি সমস্ত ক্ষণ কাঠের মতো খাড়া থাকলেন, মাঝে মাঝে পিছু হটলেন ও এগিয়ে গেলেন, তাঁর বক্তৃতার খসড়া রইল তাঁর সামনে কয়েক হাত দূরে আঁটা। হাসলেনও না, হাসালেন না। যখন লেখেন বোধ হয় খেয়াল থাকে না যে তিনি অভিজাতবংশীয়, যখন মঞ্চে দাঁড়ান তখন আভিজাত্যের সংস্কার এসে তাঁর অজ্ঞাতসারে তাকে দারুভূত করে। কণ্ঠস্বর গম্ভীর, মুখভাব পরিবর্ত্তনহীন। সুগঠিতদেহ সুপুরুষ, কেশগুলি পক্ব, কিন্তু বার্দ্ধক্যের অন্য কোনো লক্ষণ নেই।

তার কিছু দিন পরে সেইখানেই বার্নার্ড শ'র বক্তৃতা। শ'রও একটা খসড়ার মতো ছিল, কিন্তু তিনি সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন না, তাঁর দৃষ্টি আমাদের সকলের দিকে। কী আশ্চর্য্য তাঁর কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ, যেন তিনি গানের জন্যে গলা সেধে গলাটিকে সুরেলা করেছেন, আর তাঁর কথাগুলি এত স্পষ্ট যে কেউ যদি ভুল শুনে তবে তা কানের দোষ। বিষয়টি মনে নেই, তবে ফেবিয়ান সোসাইটির উদ্‌যোগে বক্তৃতা, সোশ্যালিজম সংক্রান্ত। তাতে হাসির কথা ছিল। শ'র বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি ভাববার কথাকেও হাসবার কথা করে তুলতে পারেন। তা ছাড়া তিনি সব সময়েই রসিক, মঞ্চে যতক্ষণ ছিলেন সমস্তক্ষণ রসিকতা করছিলেন। এক এক সময়ে দুষ্টুমি করে হাসি জোগাচ্ছিলেন। বৈজ্ঞানিকদের উপর কটাক্ষ করতে গিয়ে "ল্যাবরেটরি"র উচ্চারণ

করলেন "ল্যাভটরি।" তাঁর মতো চঞ্চল ও প্রাণপূর্ণ পুরুষ তাঁর বয়সে দেখা যায় না।

তার পরে শ' যখন নেমে একটু অপেক্ষা করে আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন তখন লক্ষ্য করলুম তাঁর পোষাক অতি সাদাসিধে, কোট আর টাই ম্যাচ করছিল কি না সন্দেহ। বই লিখে বহু টাকার মালিক তিনি, পৃথিবীর সব চেয়ে ধনী লেখক। কিন্তু নিজের জন্যে ব্যয় করেন অতি সামান্য, থাকেন একটা ফ্ল্যাটে—তখন থাকতেন। তাঁর ব্যবহারও তেমনি সাদাসিধে। মঞ্চে তাঁর আচরণে একটু যেন অভিনয়ের ভাব আসে, নেমে এলে তিনি সকলের একজন। তিনি দীর্ঘকায়, কিন্তু রোগা। আর তখন তাঁর যে বয়স সে বয়সেও তিনি তালগাছের মতো সোজা। ঠিক যেন একটি তালপাতার সেপাই।

ওয়েলসকে আমি বিলেতে দেখিনি। দেখি আড়াই বছর আগে বোম্বাই শহরে। তিনি অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছিলেন, জাহাজ যে কয় ঘণ্টা বোম্বাইতে থামে সেই কয় ঘণ্টার জন্যে শহর দেখতে বেরিয়েছিলেন। মাদাম ওয়াডিয়া তাঁর ওখানে আমাদের জনকয়েককে ডেকেছিলেন ওয়েলসের সঙ্গে আলাপ করতে। সময় অল্প, আমার বোধ হয় কোনো আশাই ছিল না মহিলাদের ভিড় ঠেলে তাঁর কাছে ভিড়বার, যদি না মহিলাদের মধ্যে কে একজন লজ্জাশীলা আমাকেই দূত রূপে পাঠাতেন তাঁর জন্যে অটোগ্রাফ আনতে। আমিও সেই খাতাখানা পতাকার মতো ধরে পথ করে নিলুম ওয়েলসের কাছে। বিলাতের বৈজ্ঞানিকদের

সভায় ওয়েলস কী বলেছিলেন, কী করে তাঁদের দ্বারা বিশ্বের দুর্গতি মোচন হবে, এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে দুটো একটা কথা হতে না হতেই চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে আছেন লীলাবতী মুন্‌শী। আমার বসে থাকা বিশ্রী দেখায়, বিশেষতঃ মহিলাটি যখন মহামান্য মন্ত্রীর স্বনামধন্য পত্নী এবং ইতিমধ্যে একদিন আমাকে চা'য়ে ডেকে ধন্য করেছেন। মাঝখান থেকে আমার অটোগ্রাফ নেওয়া হলো না।

ওয়েলস্ মানুষটি বেঁটেখাটো, গোলগাল, আঁটসাট। তাঁর পোষাক সাদাসিধে, কিন্তু শ'র মতো অপরিপাটী নয়। তিনি একান্ত মৃদুভাষী, কথা বলেন ধীরে ধীরে, কথাও এমন কিছু চটকদার নয়। তাঁকে দেখতে বেশ ভালো লাগে। চেহারা ভালো হোক না হোক তাঁর মুখে এক প্রকার অদম্য ভাব আছে। ইংরাজ জাতির প্রধান গুণ এই অদম্যতা। হাজার বিপদ ঘটলেও তারা দমে না, তারা সহজভাবে নেয়। হাজার ধাক্কা খেলেও তারা নড়ে না, অটল থাকে। আত্মপ্রত্যয়ের জন্যে তিনি ও তাঁর স্বজাতি সুবিখ্যাত। ওয়েলস্ কিন্তু অকপট ও নিরহঙ্কার। তিনি যতক্ষণ ছিলেন সকলের সঙ্গে সমান হয়ে মিশেছিলেন, বুঝতে দেননি যে তিনি আমাদের চেয়ে বড।

বিনু

১

বিনু যখন খুব ছোট তখন তার বাবা তাকে এক আলমারি বই দিয়ে বললেন, "এখন থেকে তোর কাছে রইল এর চাবী।" বিনু যেন স্বর্গ হাতে পেল। বইগুলি পড়ে বোঝবার মতো বিদ্যা তার ছিল না, তবু দিনরাত নাড়াচাড়া করত। বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, ছোট বড় কত রকম বই। হঠাৎ একদিন সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল গৃহদাহে। বিনুর সে কী দুঃখ! তারপর তার কাকা আনিয়ে দিলেন একখানা শিশু মাসিক। তা পড়ে তার সখ গেল সেও মাসিক পত্র চালাবে। হাতে লিখে বের করল একখানা নকল মাসিক, তাতে বিজ্ঞাপনেরও নকল থাকত। ত্রিবর্ণ আর একবর্ণ চিত্র বিনু নিজে আঁকত। গল্প আর কবিতা, নাটক আর উপন্যাস অভাব ছিল না কিছুরই। অভাব ছিল শুধু পাঠকের।

এমনি করে তার সাহিত্যচর্চ্চার হাতে খড়ি হল। তারপর এক শুভদিনে স্কুলের ছেলেদের সমিতির আলমারি পড়ল বিনুর হাতে। বিনু ক্লাস পালিয়ে সমিতির ঘরে ঢুকত, আলমারি খুলে

কেবল মাসিকপত্র পড়ত। তখনকার দিনের প্রায় সবক'টি প্রসিদ্ধ মাসিক নেওয়া হত বিনুদের স্কুলে। তাদের মধ্যে ছিল "সবুজ পত্র।" বিনু যে ওর এক বিন্দু বুঝত তা নয়, কতই বা তখন তার বয়স, বারো কিম্বা তেরো। তবু সেই বয়সেই তার আশ্চর্য্য লাগত বীরবলের লেখা, তাঁর স্টাইল, তাঁর রসিকতা। তখন থেকে মনে মনে সে তাঁর একলব্য।

কিন্তু এই সব পড়াশুনার সম্ভ ফল কিছুমাত্র ছিল না। বিনুর মাসিকপত্র বন্ধ হয়ে গেছল, কেননা পরের নকল করতে তার উৎসাহ ছিল না। সে প্রায় সমস্তক্ষণ পড়ত। তাও পাঠ্যপুস্তক নয়, এই সব মাসিকপত্র ও সাহিত্যগ্রন্থ। ইংরাজী মাসিকপত্র পড়তে পড়তে সে চলে গেল আর এক রাজ্যে। ভাবতে থাকল কী করে একদিন জাহাজের খালাসী হয়ে দেশান্তরে পালাবে। তারপর ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্র পড়তে পড়তে তার দৃষ্টি পড়ল রাজনীতির উপর। অমৃতসর, গান্ধী, খেলাফৎ। এ সকলের ঠিক মানে বোঝবার মতো বয়স তার হয়নি, তবু তারও ইচ্ছা যেত দেশের কাজ করতে। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তার ধারণা জন্মেছিল সেও অমন আগুনভরা সম্পাদকীয় লিখতে পারে, বানাতে পারে এক একটি কাগজের বোমা।

বিনু একদিন সত্যি সত্যি এসে কলকাতার রাজপথে হাঁটাহাঁটি সুরু করে দিল। উদ্দেশ্য সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়ে দেশ উদ্ধার। অথবা খালাসী হয়ে জাহাজে চড়ে আমেরিকা যাত্রা। দুটোর কোনোটাই হল না। সম্পাদকদের একজন বললেন,

"এডিটোরিয়াল লিখতে চাও, বেশ কথা। কিন্তু তার আগে শিখে রাখতে হয় প্রুফ দেখা" প্রুফ দেখে বিনুর চক্ষুস্থির। আর একজন বলেন, "আগে শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং, তার পরে জর্নালিজম।" শর্টহ্যাণ্ড শিখতে গিয়ে বিনুর কান্না পেল। কোথায় কাগজের বোমা, অগ্নিবর্ষী কামান। আর কোথায় সরু সরু দাঁড়ি আর ডট। জাহাজের দিকে তাকিয়ে বিনুর বুক কাঁপে। সাত সমুদ্র তেরো নদী। একবার খালাসী হলে কি আর খালাস আছে!

কলেজে ভর্ত্তি হয়ে বিনু পরাজয়ের গ্লানি পরিপাক করল। জীবনের প্রথম পরাজয়। সেই গতানুগতিক গোলামখানা, জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন পাঠ্য গ্রন্থ, শিক্ষায়তনের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে কৃত্রিম জীবন। অসহযোগীরা অধিকাংশই ফিরছিলেন, প্রত্যেকেই এক একটি বিনু, কে কাকে লজ্জা দেবে? সকলে সকলের লজ্জা ভাগ করে নিল। তবু সেই পশ্চাদ্ অপসরণের গ্লানি বিনুকে বহু দিন নিস্জীব করেছিল। মনের সেই নিরবলম্ব অবস্থায় সে সাহিত্যের দিকে মন দিল। এত দিন সাহিত্যের খোঁজ রাখেনি, আবার নতুন করে পড়ল। এবার পড়ল ইবসেন, বার্ণার্ড শ, টলস্টয়, টুর্গেনিভ, ডস্টইয়েভস্কি, রলাঁ। বিশুদ্ধ সাহিত্য তাকে তৃপ্তি দিল না, সাহিত্যের ভিতরে সে অন্বেষণ করল সামাজিক তাৎপর্য্য, social significance. নানা বিচিত্র সমস্যার ঘূর্ণীপাক তাকে ব্যাকুল করল। তার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের পসরা নিয়ে সাহিত্যের বাজারে ফেরি করার কথা তার

মনে ওঠেনি। নিজের কাঁদুনি নিয়ে কবিতা লিখতে, নিজের কল্পনা ফলিয়ে গল্প লিখতে তার রুচি ছিল না। সে যদি কোনো দিন কলম হাতে নেয় তবে সেই কলম হবে তার তলোয়ার, তাই দিয়ে সে কালাপাহাড়ী করবে, এই ছিল তার তৎকালীন স্বপ্ন। সাহিত্যিক—বিশুদ্ধ সাহিত্যিক—হতে তার ইচ্ছা ছিল না, সে আশাও করেনি যে একদিন সে হবে কবি কথা সাহিত্যিক।

কিন্তু ভাগ্যদেবতার চক্রান্ত চলছিল তাকে সাহিত্যিক করবার। বিনু প্রেমে পড়ল। প্রেমে পড়ে তার প্রধান কাজ হল চিঠি লেখা, তার পরে কবিতা লেখা। তিনটি বছর এই সাধনায় সমাহিত থেকে সে আবিষ্কার করল যে সে লিখতে জানে। এর জন্যে তাকে শর্টহ্যাণ্ড শিখতে হবে না, প্রুফ দেখতে হবে না, শুধু অন্তরের কথা অন্তরের তটে পৌঁছে দিতে হবে। তার লেখনী যেন খেয়ানৌকা, এ কূল থেকে ও কূলে পার করাই তার কাজ। কাগজের বোমা, কাগজের তলোয়ার কোথায় পড়ে রইল। বিনু হলো খেয়ানৌকার পাটনী।

তার সাধনা কথা বলার সাধনা। বোবা সংগ্রাম করছে সবাক হতে। ভাবপ্রকাশের জন্যে সংগ্রাম, struggle for expression. পাঠক তো মাত্র একজন। সেই একজনের জন্যে কী অবিশ্রাম উদ্যম! বলতে হবে, ঠিক মতো বলতে হবে, পরিমিত ভাবে বলতে হবে, হাতে রেখে বলতে হবে। একটিও শব্দ বেশী হবে না, কম হবে না, অপ্রযুক্ত হবে না। পাঠক যদিও একজন তবু লেখা হবে সকলের সেরা। বিনুর প্রয়াস

যাতে তার প্রত্যেকটি কথা হয় পড়বার মতো, দু'বার পড়বার মতো, আবার পড়বে বলে তুলে রাখবার মতো। যে কৌটায় বিনুর প্রাণ আছে সে কি নিতান্ত একখানা চিঠি? সে সাহিত্য দু'জনের গোপনীয় সাহিত্য।

এর পরে বিনু চলে গেল মথুরায়। তার প্রেমের পরিণতি মাথুর। যাবার আগে তার এই প্রত্যয় জেগেছিল যে সে সাহিত্যিক ছাড়া আর কিছু নয়, সাহিত্য ছাড়া আর সবই তার কাছে পরধর্ম। যে জীবিকা সে অবলম্বন করেছিল তাতে তার মন ছিল না। কী আর করবে? সাহিত্যিক হিসাবে তার আয় এক পয়সাও না, কিন্তু বাঁচতে হলে পয়সা দরকার। সাহিত্যই যদি তার জীবিকা হতো তা হলেই জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য হতো। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন অপর কোনো জীবিকা স্বীকার করতেই হবে, নইলে অনশন। অসামঞ্জস্যের কাঁটা ফুটে থাকল তার মর্মে।

২

যেদিন জানল যে সাহিত্যিক ছাড়া আর কিছু নয় সেদিন থেকে তাকে পীড়া দিতে থাকল দুটি প্রশ্ন। এক, কিসের জন্যে সাহিত্য? দুই, কাদের জন্যে সাহিত্য?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কেউ বলতেন, জাতীয় ভাবধারায়

অবগাহন করে জাতীয় বেশ পরিধান করে বিশ্বসভায় যাতে আসন পায় এই দেশ সেইজন্যে সাহিত্য। কেউ বলতেন শিক্ষার জন্যে, সমাজ সংস্কারের জন্যে, সমাজবিপ্লবের জন্যে দেশের স্বাধীনতার জন্যে জনমনের আত্মপ্রকাশের জন্যে, সাহিত্য। কেউ বা বলতেন, চিত্তশুদ্ধির জন্যে, ভাগবত উপলব্ধির জন্যে, দেবজীবনলাভের জন্যে, নৈতিক উৎকর্ষের জন্যে সাহিত্য। এমনি কত কথাই বিনু শুনল। মথুরায় গিয়ে দেখল, ওখানে মানুষকে এমন ভাবে ব্যবচ্ছেদ করা হচ্ছে যেন মানুষ বলে কিছু নেই, আছে তার দেহ, তার মন, তার ব্যবহার, তার এলোমেলো চিন্তা ও লাফ দিয়ে চলা স্বপ্ন, তার চেতনাপ্রবাহ, তার অবচেতনা, তার রকমারি কম্প্লেক্স, তার কত রকম রিফ্লেক্স। সাহিত্য বলতে ওখানে কী না বোঝায়! বিনু তো দিশা হারাতে বসল। তখন তার হৃদয় বলে উঠল, না, না, নেতি, নেতি।

আর্টের মধ্যে অনেক জিনিষ আসতে পারে, যেমন নৌকার মধ্যে। কিন্তু আর্টকে হতে হবে আর্ট। সাহিত্যকে হতে হবে সাহিত্য। কী করে তা হবে সে কৌশল যারা জানে তারাই সাহিত্যিক, তারাই আর্টিস্ট। তারা হৃদয়বান, তারা বিদগ্ধ, তারা মানুষকে মানুষ বলেই ভালোবাসে, প্রকৃতিকে প্রকৃতি বলেই। তারা সৃষ্টি করে সৃষ্টির জন্যেই, লেখনী দিয়ে খেলনা বানায় খেলার জন্যে।

কিসের জন্যে আর্ট? আর্টের জন্যে। আর্ট ফর আর্টস

সেক—এই উত্তরই আর্টিস্টের উত্তর, যদি তিনি আর্টিস্ট হয়ে থাকেন। যাঁদের উত্তর অন্যরূপ তাঁরা আর্টিস্ট নন, তাঁরা ছদ্মবেশী শিক্ষক কিম্বা সংস্কারক, সৈনিক কিম্বা বিপ্লবী। তাঁরা বায়োলাজিষ্ট কিংবা প্যাথোলজিস্ট হয়তো, অথবা সাইকোয়্যানালিষ্ট। তাঁরা দেশানুরাগী কিম্বা গণপ্রেমিক হয়ত, অথবা যোগী। আর্ট ফর সেক তাঁদের অনুমোদন পায় না। তাঁরা বলেন, Art for the sake of something higher, কিন্তু বিনু বলে, জগতে আর্টের চেয়ে বড় অনেক কিছু আছে, কিন্তু আর্টিস্টের কাছে আর্টের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। সতীর চোখে তার নিজের পতিটিই সকলের চেয়ে সুন্দর, মহৎ, শ্রেষ্ঠ—যদিও অপরের চোখে পাজী আর নচ্ছার, কালো আর কুৎসিত। তেমনি আর্টিস্টের কাছে আর্টই highest, তার চেয়ে higher কিছু নেই। তাই তার বন্ধু যখন প্রশ্ন করেন, আর্টাৎ পরতরং নহি? সে উত্তর দেয় নহি।

সাহিত্যকে হতে হবে সাহিত্য। সে কৌশল যারা জানে তারাই সাহিত্যিক, তারাই আর্টিস্ট্। তারা তো বলবেই, আর্ট ফর আর্টস সেক, সাহিত্যের জন্যে সাহিত্য। কিন্তু এর মানে এমন নয় যে আর্টের জগৎ একটা অন্ধকূপ, তার ভিতরে বাইরের আলো হাওয়া যাওয়া আসা করে না। এমন নয় যে শিল্পী বাস করে গজদন্তের গম্বূজে, দুনিয়া পুড়ে ছারখার হলেও তার বেহালা বাজানো বন্ধ হয় না। বিনু বলে, আমি ভালোবেসেছি। কখনো নারীকে, কখনো শিশুকে, কখনো বন্ধুকে, কখনো

অপরিচিতকে, কখনো দেশকে, কখনো বিদেশকে। কখনো আইডিয়াকে, কখনো আইডিয়ালকে। আমি ভালোবেসেছি মানুষকে ও মানুষের পরে প্রকৃতিকে। সেই ভালোবাসা আমাকে হাতে ধরে লিখতে শিখিয়েছে, হাতে ধরে লিখিয়েছে। আমি তোমার সৌখীন লেখক নই, না লিখলেও যার চলে। অথবা নই পেশাদার লেখক, না লিখলে যার চলে না। যাদের দেখেছি চিনেছি ভালোবেসেছি তাদের কথা লিখেছি, প্রাণ দিয়ে লিখেছি, লেখায় প্রাণ সঞ্চার করেছি। আমি প্রেমিক লেখক। ধর্ম বা নীতি, জাতীয়তা বা সাম্যবাদ, মনোবিকলন বা জৈব ব্যবহার, সাহিত্যে এদের সকলের স্থান আছে, কেননা জগতে এদের স্থান আছে। আমি তো এমন কথা ব'লিনি যে, ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী। আমার তরীতে ঠাঁই দিয়েছি সবাইকে। কিন্তু ভাই, আমার সোনার তরীতে যদি সোনার ধানই না থাকল তবে বাকী সব থেকে হবে কী? ও কি সাহিত্য হবে? যখন বলি আর্ট ফর আর্টস সেক তখন শুধু এই কথাই বলি যে সোনার ধানের জন্যে সোনার তরী। তা ব'লে অন্য জিনিষকে বাদ দিইনে, ওজন বুঝে জায়গা দিই।

এবার বিনুর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা। কাদের জন্যে আর্ট? এই ভেবে বিনু একদা কাতর হয়েছে যে তার এত পরিশ্রম বৃথা যাচ্ছে, জনসাধারণের কাজে লাগছে না, ভোগে লাগছে না। ভেবেছে বোধ হয় তার লেখার মধ্যে এমন মাধুরী নেই যার জন্যে

জনসাধারণ চাতকের মতো তার দিকে চেয়ে রইবে। দোষটা তবে কার? এই অপরূপ সমাজব্যবস্থার যা শতকরা সাতজনকে অক্ষর চিনতে শিখিয়েছে, হয়তো একজনকে বই কিম্বা মাসিক কেনবার মতো অর্থ দিয়েছে? অথবা বিনুর নিজের? দোষটা বিনু নিজের ঘাড়ে টেনে নিয়ে মনে মনে বড় কষ্ট পেয়েছে। যে দেশের সমাজব্যবস্থা এইরূপ সেদেশে জন্মিয়ে তার প্রথম কর্ত্তব্য কি নয় দেশকে নতুন সমাজব্যবস্থা দেওয়া? সাহিত্যসৃষ্টির আগে সমাজ ভাঙাগড়া, রাষ্ট্র ভাঙাগড়া? কিন্তু তাই যদি করে তবে লিখবেই বা কবে, কোন জন্মে? যদি ভাঙাগড়ার কথাই লেখে তবে সে কি হবে সাহিত্য? সাহিত্য কি সমাজের প্রয়োজনে হয়? না, অন্তরের প্রেরণায়?

বিনু হৃদয়ঙ্গম করল যে ইচ্ছা করলে সমাজ ভাঙাগড়ার কথা লেখা যায়, কিন্তু তার দ্বারা না হয় সমাজের পরিবর্ত্তন, না হয় সাহিত্যের সৃজন। যে সমস্যা এক দিনের নয় সে সমস্যা রাতারাতি যাবার নয়, যারা তার জন্যে দেহপাত করতে ইচ্ছুক তাদের জীবনব্যাপী অধ্যবসায় করতে হবে। কে জানে কত কাল লাগবে শতকরা সাতাশ জনকে সাক্ষর করতে, শতকরা দশ জনকে বই কেনবার অর্থ দিতে? জনসাধারণের সাহিত্য-রসাস্বাদন বিনুর জীবনে হবার নয়। বিনু তা হলে করবে কী? লিখবে না, যেহেতু মাত্র জনকয়েক মধ্যবিত্ত পাঠক তার উপভোগী? লিখবে, কিন্তু ভাঙাগড়ার কথাই লিখবে? অথবা লিখবে এমন ভাবে যেন এক দিন শিক্ষাবিস্তার ও বিত্তবিভাজন

হলে সব শ্রেণীর লোক সেই সৃষ্টির অধিকারী হতে পারে? দিয়ে যাবে এমন একটা রস যা সমাজবিপ্লবের আগে রাষ্ট্রবিপ্লবের আগে ফুরিয়ে যাবে না, জনসাধারণ যতদিন না ভোগক্ষম হয় ততদিন বর্ত্তে থাকবে? এমন এক অমৃত যা আপাতত অল্প কয়েকজনের পাতে পড়লেও কালক্রমে সর্ব্বজনের হাতে পড়বে?

প্রথম কর্ত্তব্য—বিনু বুঝল—অমৃতমন্থন। অমৃত যখন উঠে আসবে সেবস্তু সকলের জন্যেই আসবে, যদিও উপস্থিত জনকয়েক ভাগ্যবন্ত তাঁর ভোক্তা। কাদের জন্যে লিখেছে, এ প্রশ্ন তাকে বিমর্ষ করলেও আসল প্রশ্ন, কী লিখেছে? যা লিখছে তা কি অমৃতরুচি? যদি অমৃতপিপাসা মেটাতে পারে তবে আজ তার দ্বারা জনকয়েকের হলেও এক শতাব্দী পরে কোটি কোটি জনের তৃষা মিটবে। তার রচনা হবে চিরকালের ক্লাসিক। আর যদি অমৃতের সন্ধান না পায় ও অমৃতের মধুচক্র না রচে তবে আজকের জনসাধারণ তাকে মাথায় তুলে নাচলেও কালকের জনসাধারণ তাকে পুছবে না।

কাদের জন্যে সাহিত্য? যারা ভালোবাসে ও ভালোবাসবে তাদের জন্যে। যারা রস পায় ও পাবে তাদের জন্যে। যারা আজ সমাজব্যবস্থার দরুণ রস পানে বঞ্চিত তাদের জন্যে বিনুর দুঃখ হয়, কিন্তু যারা বঞ্চিত নয় তারাও কি বিনুর লেখা কিনে পড়ছে ও পড়ে আনন্দ পাচ্ছে? যাদের ক্ষমতা আছে তাদের কি পিপাসা আছে? না যদি থাকে তবে জনসাধারণের জন্যে

মাথাব্যথাটা মাথার বাজে খরচ। তারা শিক্ষিত ও সমর্থ হলেও ঠিক এমনি উদাসীন হতে পারে সাহিত্যের প্রতি, ক্লাসিক ফেলে ডিটেকটিভ নভেল পড়তে পারে।

৩

ক্লাসিক রচনার অভিলাষ নিয়ে বিনু এর পরে ক্লাসিক পড়ল। গ্রীক ট্র্যাজেডী, সংস্কৃত কাব্য, দান্তে শেক্সপীয়ার গোটে টল্‌স্টয় রবীন্দ্রনাথ, এসব নাড়াচাড়া করে তার এই প্রত্যয় দৃঢ় হলো যে জীবনের উপলব্ধি গভীর না হলে সাহিত্যে গভীরতা আসে না, সাহিত্যকে আলো জোগায় জীবন, যেমন সূর্য্য জোগায় চাঁদকে। লিখে ফল কী, যদি বাঁচতে না জানি, ঠিকমতো না বাঁচি! সে লেখা দু'দিন একটু ঝিকিমিক করবে, তার পরে নিবে যাবে। তাতে থাকবে না জ্যোৎস্নার সুধা, যে সুধার উৎস হচ্ছে জ্যোতি।

বিনুকে যেতে হলো জীবনের কাছে। সাহিত্যের সূর্য্যস্বরূপ জীবন। জীবন যে তার একেবারেই অজানা ছিল তা নয়, জীবনের কাছেই সে নিয়েছে প্রেমের পাঠ। কিন্তু সেই বিদ্যা যথেষ্ট নয়। কী করে আরো গভীর ভাবে বাঁচবে এই জিজ্ঞাসা তাকে অধীর করল। সে নানা কাজে যোগ দিল, নানা লোকের সঙ্গে মিশল, নানা স্থানে ঘুরল। তার লেখা কমে এলো, কমতে কমতে এক সময় থেমে গেল। লেখনী তুলে নিলেও হাত চলে

না, হাতের যেন পক্ষাঘাত। বিনুর মনে হতে লাগল তার লেখার পাট চুকেছে। সে ইচ্ছা করলেও লিখতে পারবে না, সে লেখক নয়, ভূতপূর্ব্ব লেখক। নিজের এই অসহায় দশায় তাকে সান্ত্বনা দিত তার বিশ্বাস। সে বিশ্বাস করত যে লেখার চেয়ে ঢের বেশী প্রধান সত্যিকারের বাঁচা। লেখবার অভ্যাস একবার গেলে আবার আসে না অনায়াসে। তবু তাতেও ক্ষতি নেই যদি জীবনের অভিজ্ঞতা জমতে জমতে জমাট বাঁধে। যার উপর জীবনদেবতার স্নেহ আছে তাকে বাণীও বর দেন সাদরে।

জীবনের জলে স্নান করে বিনু ক্রমে জ্ঞানলাভ করল যে ওটুকু স্নানে তার তৃপ্তি হবে না, অবগাহন করতে হবে অগাধ সলিলে। মহামানবের সাগরতলে ডুব দিতে হবে, তবে যদি পায় মানবজীবনের অমৃত। বিনুর কি এত সাহস আছে যে সে ডুব দিতে পারবে? বিনু এই আইডিয়াটা নিয়ে মনে মনে খেলা করে। আজ নয়, কাল। কাল নয়, পরশু। এমনি করে তার দিন মাস বছর কাটে। দশকও কাটল। এইখানেই তার ট্র্যাজেডী। সে যদি জলে নামল তবে আরো গভীর জলে কেন করল না অবগাহন?

ভীরু। ভীরু। ভয়ানক ভীরু সে। তবে তাকে আমি কাপুরুষ বলব না। সে পৌরুষের পরিচয় দিয়েছে জীবনের অনেক পরীক্ষায়। কাপুরুষ নয়, ভীরু সে। সাগরতীরে জলকেলি করে দিনের আলো অপচয় করল। এখন আসছে আঁধার। শুধু

যে তার নিজের জীবন আঁধার অর্থাৎ পাকা চুল, তাই নয়। দেশের জীবনেও আঁধার, অর্থাৎ অনিশ্চয়তা। ইউরোপের জীবনে তো মহা তমসা, ঘোর বর্ব্বরতা। এই ঘনায়মান সন্ধ্যায়—যুগসন্ধ্যায়—যৌবন সন্ধ্যায় বিনুর পাত্রে সুধা কই? কই সেই জীবনসার যা মৃতকেও নবজীবন দেবে, মুমূর্ষুকে দেবে সঞ্জীবনী আশা?

মুক্তা নেই, আছে গুটি কতক নানা রঙের ঝিনুক। সাগরতীরে বসে বসে বালুর ঘর গড়েছে আর এই সব কুড়িয়েছে বিনু। সেই বালুর ঘরেও ভাঙন ধরেছে। আর সেই সব ঝিনুকও ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। তা হলে বিনু তুমি করলে কী!

যাক, বিনু হচ্ছে বিনু। সে যা সে তাই। যার যতটুকু দম তার ততটুকু দৌড়। বিনু যে টলস্টয়কল্প নয় এর জন্যে আফশোষ করে কী হবে? স্বয়ং টলস্টয় কি ব্যর্থ হননি? সাগরতলে ডুব দিয়ে তিনি কি তুলতে পারলেন অমৃত? জনগণের সঙ্গে বাস করলেন, কিন্তু এক হতে পারলেন কি? জনগণের মন চিনলেন। কিন্তু মন পেলেন কি? তাদের জন্যে কত লিখলেন। তারা পড়ল কি তাঁর শেষ জীবনের সেইসব লেখা? এত বড় ট্র্যাজেডী পৃথিবীতে বেশী হয়নি। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকে তিনি ঘৃণা করে সরিয়ে রাখলেন, কেননা ওতে রয়েছে অভিজাতদের অশুচি জীবনকথা। শেষ বয়সে প্রায়শ্চিত্ত করে ওসব তো তিনি বিসর্জ্জন দিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের দেশেই এমন দিন এলো

যেদিন অভিজাত বলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল তাঁর প্রিয়তম জনসমাজ, বিপ্লবী জনসমাজ।

আশার কথা এই যে ধীরে ধীরে দিন ফিরছে। টল্‌স্টয়ের বই আজকাল খুব চলছে রাশিয়ায়। সেসব বই যে কেবল তাঁর শেষ জীবনের প্রায়শ্চিত্তের পরের বই তা নয়, প্রথম বয়সের সেই সব পঙ্কিল জটিল চঞ্চল অলস চিন্তাকুল ভাবালু বীর্য্যবান সম্ভ্রান্ত সমাজের চিত্র। কারণ কী? কারণ সেগুলিও আর্ট। আর্টের আকর্ষণ দুর্ব্বার।

বিন্নু নিজেকে টল্‌স্টয়ের সঙ্গে তুলনা করতে চায় না। টলস্টয়ের ছিল সাহস, বিন্নুর তা নেই। বরং তুলনা করা চলে চেখভের সঙ্গে তার। চেখভ যে সমাজের কথা, যে সময়ের কথা, যেমন কারুণ্যের সঙ্গে লিখতেন বিন্নুর সময় সময় মনে হয় সেও সেই সমাজের কথা, সেই সময়ের কথা, তেমনি কারুণ্যের সঙ্গে লিখছে। আসবে ঝড়, উড়বে ধূলো, কোথায় থাকবে আমাদের এই মধ্যবিত্ত অবসরবিহারী সভ্যতা?

তা বলে ঝড়ও চির দিন থাকে না, ধূলো মরে যায়। নতুন করে অবসরবিহারী গজায়, অবসরসম্পন্ন শ্রেণী মাটি ফুঁড়ে বেরোয়। অবসর না হলে, আলস্য না হলে জীবনের সঙ্গে পরিচয় পাকা হয় না, তাই সাহিত্যেরও উৎকর্ষ হয় না। রুশদেশেও চেখভ পড়ে উপভোগ করবার মতো শিক্ষিত সংস্কৃতিমান সংবেদনশীল মন বিবর্ত্তিত হবে। তেমনি এ দেশেও।

তাই স্বষ্ট সাহিত্যের ব্যর্থতা নেই। বিনুর এই সব নানা রঙের ঝিনুক অদূর ভবিষ্যতে উপেক্ষিত হলেও সুদূর ভবিষ্যতে আকাঙ্ক্ষিত হবে, যদি থাকে তাদের মধ্যে একটি হৃদয়ের প্রেম, একটি মনের ধ্যান, একটি জীবনের স্বপ্ন, একটি মানুষের প্রাণ।

১৯৪০-৪১

ব্লক ও মুদ্রণ—বেঙ্গল অটোটাইপ কোং, কলিকাতা।